গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭২ বর্ষ ১৮ সংখ্যা | ১৩ - ১৯ ডিসেম্বর ২০১৯ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা

মানুষকে ‘অমানুষ’ করার শাসক শ্রেণির ষড়যন্ত্র প্রতিহত করুন

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

হায়দরাবাদের ঘটনা প্রসঙ্গে দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৭ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন,

২৭ নভেম্বর রাতে হায়দরাবাদে এক চিকিৎসক তরুণীর নির্মম ধর্ষণ ও হত্যা এবং তার পরে পুলিশের হাতে সেই ঘটনায় অভিযুক্ত চার অভিযুক্তের মৃত্যুর ঘটনা গোটা দেশকে নাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে আজ আর এ কোনও বিচ্ছিন্ন একটি ঘটনা নয়।

শাসক বুর্জোয়া শ্রেণি ও তাদের সেবাদাস সরকারগুলি মদ, ড্রাগ, পর্নোগ্রাফি, ব্লু ফিল্মের ব্যাপক প্রসার ঘটিয়ে যুবসমাজের এক বড় অংশকে অপরাধপ্রবণতা ও যৌনদাসত্বের শিকারে পরিণত করছে। এর ফলে যেকোনও বয়সের মহিলাদের ধর্ষণ, গণধর্ষণ ও হত্যা নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে গভীর বেদনা, উদ্বেগ ও ক্রোধের সৃষ্টি করেছে।

অত্যন্ত ক্ষোভের সাথে মানুষ লক্ষ করছে যে এ ধরনের ঘটনা বার বার হওয়া সত্ত্বেও, কেন্দ্র কিংবা রাজ্য সরকারগুলি, তাদের পুলিশ-প্রশাসন ও বিচারবিভাগ মহিলাদের জন্য প্রয়োজনীয় সুরক্ষা এবং অপরাধীদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হচ্ছে। এমনকি কিছু কিছু অপরাধী শাসক দলগুলির মদতে রক্ষাও পেয়ে যাচ্ছে।

হায়দরাবাদের ঘটনায় অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর পুলিশ-প্রশাসন সময়মতো পদক্ষেপ না নেওয়ায় গোটা দেশ জুড়ে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। পুলিশ বাধ্য হয় অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করতে। পরে ৬ ডিসেম্বর রাত তিনটের সময় ঘটনার পুনর্নির্মাণের জন্য ওই অভিযুক্তদের পুলিশ অকুস্থলে নিয়ে যায় এবং পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী, পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে চার অভিযুক্তেরই মৃত্যু হয়।

লক্ষণীয় পুলিশ কর্তৃক চার অভিযুক্তের হত্যার ঘটনায় জনসাধারণের একাংশ যেমন উল্লাস প্রকাশ করছে, তেমনই অন্য একটি অংশ এ সম্পর্কে

দুয়ের পাতায় দেখুন

সাম্যবাদের মূল নীতি
তিনের পাতায়

মধ্যপ্রদেশে ছাত্রদের শোকজ্ঞাপন

গোয়ালিয়র। ৩ ডিসেম্বর

দিল্লিতে শ্রমিক মৃত্যুর জন্য দায়ী মালিক, প্রশাসন ও সরকারের অপরাধমূলক অবহেলা

প্রভাস ঘোষ

৮ ডিসেম্বর রাতে দিল্লিতে একটি কারখানায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে ৪৩ জন শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনায় শোক প্রকাশ করে ৯ ডিসেম্বর এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ এক বিবৃতিতে বলেন,

দিল্লিতে এতজন শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা আবারও আমাদের দেখিয়ে দিল, গরিব শ্রমিকরা শুধু যে নির্মম অর্থনৈতিক শোষণের শিকার তাই নয়, শিল্পপতি, প্রশাসন এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের হাতে তাদের জীবনের নিরাপত্তাও নিষ্ঠুরভাবে অবহেলিত, যার পরিণামে প্রায়ই প্রাণ হারাতে হয় শ্রমিকদের।

আমরা এই অপরাধমূলক অবহেলার তীব্র নিন্দা করছি। নিহতদের শোকাহত পরিবারগুলির প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপনের পাশাপাশি আমরা সরকারের কাছে তাদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি করছি।

কেন্দ্রীয় সরকার ছাঁটাইয়ের অবাধ অধিকার দিল মালিকদের

কেন্দ্রের বিজেপি সরকার তিনটি প্রধান শ্রম আইন জুড়ে দিয়ে ‘লেবার কোড’ নামে যে বিল ২৮ নভেম্বর সংসদে পেশ করেছে, তাকে চূড়ান্ত শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী আখ্যা দিয়েছেন এ আই ইউ টি ইউ সি-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর সাহা।

২৯ নভেম্বর এক বিবৃতিতে তিনি জানিয়েছেন, ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাক্ট -১৯২৬, স্ট্যান্ডিং অর্ডার অ্যাক্ট এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউটস অ্যাক্ট -১৯৪৬ একত্রিত করে এই কোড তৈরি করা হয়েছে। শ্রম আইন সংশোধনের বিষয়ে ৪৬তম ইন্ডিয়ান লেবার কনফারেন্সে যে তিনটি মাপকাঠি নির্ধারণ করা হয়েছে, যথা শ্রমিকদের কল্যাণের অধিকার, কর্মসৃষ্টি এবং শিল্পে শান্তি— কোডের বিষয়বস্তু থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে তা চূড়ান্তভাবে লঙ্ঘন করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। শ্রমিকদের অধিকার বা কর্মসংস্থানের সঙ্গে এই লেবার কোডের কোনও সম্পর্ক নেই। বিপরীতে এই কোড মালিকদের অধিকার দিয়েছে অবাধে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের। স্থায়ী কাজে স্থায়ী শ্রমিক নিয়োগের নীতিকেও চূড়ান্তভাবে লঙ্ঘন করা হয়েছে। এই লেবার কোডকে হাতিয়ার করে মালিকরা স্থায়ী কাজে ঠিকা শ্রমিক নিয়োগ করতে পারবে, কাজ আউটসোর্সিং করবে, ফিক্সড টার্ম এমপ্লয়মেন্ট চালু করবে এবং সরকারের অনুমতি ছাড়াই নিজস্ব স্বার্থে যে কোনও সময় কারখানা বন্ধ করে দিতে পারবে। মালিকী শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ হওয়া, ইউনিয়ন গঠন করা এবং ধর্মঘট করা, যা কালের ধারায় মৌলিক অধিকারে পরিণত হয়েছে, তার উপরেও নানা বিধিনিষেধ আরোপ করছে এই লেবার কোড। কমরেড সাহা বিজেপি সরকারের এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

উন্নয়নের, নাকি বেচে দেওয়ার সরকার ?

দ্বিতীয় বার ক্ষমতায় বসেই নরেন্দ্র মোদি সরকার লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির লাগামছাড়া বেসরকারিকরণে নেমে পড়েছে। ২০ নভেম্বর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা পাঁচটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার দ্রুত বিলগ্নিকরণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। নীতি আয়োগ বিলগ্নিকরণের জন্য ২৮টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে বেছে দিয়েছে। সব মিলিয়ে প্রায় শ'খানেক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে বিলগ্নিকরণের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। বর্তমান পাঁচটি সংস্থার মধ্যে রয়েছে ভারত পেট্রোলিয়াম (বিপিসিএল), কনটেনার কর্পোরেশন (কনকর), শিপিং কর্পোরেশন, নিপকো ও তেহরি জলবিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম (টিএইচডিসিএল)। ৭৫টি জাতীয় সড়ক প্রকল্পও বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রিসভা।

রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে দিতে বিজেপি মন্ত্রীরা এত তৎপর কেন? মোদি সরকারের মুখপাত্র হিসাবে তেলমন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেছেন, ব্যবসা করা সরকারের কাজ নয়। তাঁর বক্তব্য, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার পেশাদারিত্ব বাড়াতেই সেগুলির শেয়ার বেচবে কেন্দ্র। সত্যিই কি তাই? ২২ নভেম্বর সংসদে দাঁড়িয়ে রেলমন্ত্রী পীযুষ গয়াল কিন্তু ঠিক উল্টো কথা বলেছেন। গোটা রেলব্যবস্থার বেসরকারিকরণে প্রাথমিক পর্যায় হিসাবে শ'খানেক ট্রেন বিজেপি সরকার একচেটিয়া পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দিয়েছে। স্টেশন সংলগ্ন রেলের বিপুল পরিমাণ জমিও লিজের নামে বেসরকারি মালিকদের দিয়ে দিচ্ছে। সাফাই কাজ থেকে টিকিট বিক্রি— একের পর এক পরিষেবা চলে যাচ্ছে বেসরকারি হাতে। এমনকি পুঁজিপতিদের দায়মুক্ত করতে এতদিন রেলের কাজে জমিহারাদের চাকরি দেওয়ার সংস্থানটিও প্রত্যাহার করে নিয়েছে সরকার। এই অবস্থায় রেলকর্মী থেকে সাধারণ মানুষ সকলেই সরকারের এই সিদ্ধান্তকে চরম জনবিরোধী বলে সমালোচনায় মুখর হয়েছে। এই বিরোধিতার মুখে দাঁড়িয়ে রেলমন্ত্রী দাবি করেছেন, তাঁরা আদৌ রেলে

দুয়ের পাতায় দেখুন

বেচে দেওয়ার সরকার

একের পাতার পর

বেসরকারিকরণ করছেন না। যা হচ্ছে, তা হল বাণিজ্যকরণ। অর্থাৎ রেলমন্ত্রীর মতে রেল নিয়ে সরকার ব্যবসাই করতে চাইছে। তা হলে তেলমন্ত্রী না রেলমন্ত্রী— কার কথাটা সত্য? নাকি কেউই আসল সত্যটা বলছেন না?

তা ছাড়া, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি ব্যবসা করার জন্য গড়ে উঠেছিল, বিজেপির নেতা-মন্ত্রীরা এমন তথ্য কোথায় পেলেন? স্বাধীনতার পর অর্থনীতির ভিত্তি হিসাবে মূল তথা ভারী শিল্পগুলিকে জনসাধারণের টাকায় রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প হিসাবে গড়ে তুলেছিল সরকার। শক্তি, রেল সহ সমস্ত পরিবহণ, সড়ক, বন্দর, তাপ ও জলবিদ্যুৎ, লোহা-ইস্পাত, পরমাণু শক্তি, প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম, জাহাজ নির্মাণ, তেল, কয়লা, ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মতো ভারী শিল্পগুলি ছিল এর অন্তর্গত। ঘোষণা করা হয়েছিল, জনগণের টাকায় নির্মিত রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প জনগণকে পরিষেবা দেবে। এগুলি মুনাফা লোটার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নয়। সদ্য-স্বাধীন রাষ্ট্রের অর্থনীতির ভিত্তি গড়ে তোলাই ছিল এগুলি স্থাপনের মূল লক্ষ্য। সেদিন প্রধানত পুঁজিপতিদের উৎপাদনের কাজে সুবিধা করে দিতেই সরকার পরিকাঠামো সহ ভারী শিল্পগুলি গড়ে দিলেও সেই সময় তা জনস্বার্থও অনেকখানি রক্ষা করেছিল। অথচ আজ জনস্বার্থের কোনও তোয়াক্কা না করে সেই সংস্থাগুলিকে বিজেপি নেতারা তাঁদের ঘনিষ্ঠ শিল্পপতি আম্বানি-আদানিদের কাছে জলের দামে বেচে দিচ্ছে।

বিজেপি মন্ত্রীরা বলছেন, পেশাদারিত্ব বাড়ানোর জন্যই নাকি তাঁরা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির শেয়ার বেচছেন। কিন্তু পেশাদারিত্ব বাড়ানোর জন্য শেয়ার বেচতে বা সংস্থার নিয়ন্ত্রণ বেসরকারি হাতে ছেড়ে দিতে হবে কেন? সে ক্ষেত্রে উপযুক্ত পেশাদার নিয়োগ এবং সরকারের সঠিক নজরদারিই তো ছিল তার যথার্থ উপায়। বিজেপি মন্ত্রীরা উল্টো পথে হাঁটছেন কেন? সচেতন মানুষ প্রশ্ন তুলছেন, বিজেপি নেতারা লোকসানে চলা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির শেয়ার না বেচে বিপিসিএলের মতো বিপুল লাভ করা সংস্থাগুলিকে বেচে দিচ্ছেন কেন? বিপিসিএল ২০১৮-১৯ সালে লাভ করেছে ৭৮০০ কোটি টাকা। পেশাদারিত্ব না থাকলে, পরিচালনা দক্ষ না হলে এই বিপুল পরিমাণ লাভ করল কী করে? পেশাদারিত্বের কথাটা যে অজুহাত মাত্র তা আরও স্পষ্ট হয় যখন দেখা যায় বিপিসিএলকে বেচে দেওয়া হচ্ছে মাত্র ৬০ হাজার কোটি টাকায়। বিপুল মুনাফা ছাড়াও সংস্থাটির মোট সম্পদের পরিমাণ ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৯৩০ কোটি টাকা। তার মানে, সরকার জলের দামে বেচে দিচ্ছে সংস্থাটি। এর কারণ কী? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজলেই বেরিয়ে আসবে সরকারের আসল উদ্দেশ্যটি। সরকার কাদের কাছে বেচছে এই সংস্থাগুলি?

বিপিসিএলের কথাই ধরা যাক। অর্থমন্ত্রকের পক্ষ থেকে ক্রেতা হিসাবে বেশ কিছু বিদেশি সংস্থার নাম উচ্চারণ করা হলেও সেই তালিকার প্রথম নামটিই ইদানিং প্রধানমন্ত্রীর অতি-ভক্ত সাজা মুকেশ আম্বানির রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের। ঠিক একইরকম ভাবে শিপিং কর্পোরেশন এবং কনটেনার কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে প্রথম নাম হিসাবে উঠে আসছে নরেন্দ্র মোদি-অমিত শাহদের কল্যাণে সম্পদ-বৃদ্ধিতে উল্কাগতিতে দু-নম্বরে উঠে আসা আদানি গোষ্ঠীই। 'ব্যবসা করা সরকারের উদ্দেশ্য নয়', 'পেশাদারিত্ব বাড়াতেই বিলগ্নিকরণ' ইত্যাদি কথা বলে বিজেপি নেতারা কাদের স্বার্থকে জনগণের দৃষ্টি থেকে আড়াল করতে চাইছেন, তা বুঝতে এরপর আর কারও অসুবিধা হওয়ার কথা কি?

প্রধানমন্ত্রী তাঁর সরকারের দক্ষতা বোঝাতে ঘোষণা করেছিলেন, ২০২৪ সালের মধ্যে ভারতের অর্থনীতিকে দ্বিগুণ বাড়িয়ে পাঁচ লক্ষ কোটি ডলারে পৌঁছে দেবেন। কিন্তু তাতে দেশের বেশির ভাগ মানুষের কী যায়-আসে? এর ফলে কি তাদের জীবনে দ্বিগুণ সমৃদ্ধি আসবে? তার উত্তরে মানুষকে স্তোক দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, কেক বড় হলে সবার ভাগও বড় হবে। কিন্তু কথা তো ছিল তিনি অর্থনীতির বিকাশ ঘটিয়ে এ কাজ করবেন। অর্থাৎ দেশে প্রচুর পরিমাণে কলকারখানা খুলবেন। তাতে যেমন দেশে উৎপাদন বিপুল পরিমাণে বাড়বে, তেমনই বছরে দু'কোটি করে বেকার সেখানে কাজ পাবে। কথা ছিল, সবার জীবনে 'আচ্ছে দিন' নিয়ে আসবেন, প্রশাসনে দুর্নীতি বন্ধ করবেন। বাস্তবটা কী দাঁড়িয়েছে? অর্থনীতি প্রবল মন্দায় হাবুডুবু খাচ্ছে। জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বাড়ছে। একের পর এক কারখানায় তালা ঝুলছে। লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী ছাঁটাই হচ্ছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ক্রমাগত তলানিতে নেমে যাচ্ছে। বৃদ্ধির হার নামতে নামতে প্রথম ত্রৈমাসিকে ৫ শতাংশে এবং পরের ত্রৈমাসিকে ৪.৫ শতাংশে নেমে এসেছে। অর্থনীতি ধুঁকতে থাকায় আয়কর এবং জিএসটি আদায়ও কমে গেছে। ব্যাঙ্কগুলিতে পুঁজিপতিদের শোধ না করা ঋণের পরিমাণ হু হু করে বাড়ছে। কর ফাঁকি মাত্রাছাড়া আকার নিয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিতে প্রতারণার অঙ্ক অর্থবর্ষের প্রথম ছ'মাসেই দাঁড়িয়েছে ৯৫,৭০০ কোটি টাকা। দৈনিক ২২ হাজার কোটি টাকা করে কালো টাকা জমছে। মেক ইন ইন্ডিয়া আকাশকুসুমে পরিণত হয়েছে। বেকারত্ব বৃদ্ধির হার গত ৪৫ বছরে সর্বোচ্চে পৌঁছেছে।

এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিরা সরকারের কাছে 'ত্রাণ প্রকল্পে'র আবদার জানাতে থাকে। সরকারও সেই আবদার মেনে নিয়ে কর্পোরেট করে ১ লক্ষ ৪৫ হাজার কোটি টাকা ছাড় ঘোষণা করেছে। আবাসন প্রকল্পগুলির আবদার মেনে ২৫ হাজার কোটি টাকার ফান্ড গড়ে দিয়েছে। টেলিশিল্পগুলির কাছে সরকারের ন্যায্য পাওনা ১.৩৩ লক্ষ কোটি টাকা, যা সুপ্রিম কোর্ট তিন মাসের মধ্যে মিটিয়ে দিতে বলেছিল, সরকার তা দু'বছরের জন্য স্থগিত করে দিয়েছে। অথচ পুঁজিবাদী বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, মন্দার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণটি হল, সাধারণ মানুষের কেনার ক্ষমতার অভাব। অর্থাৎ কলে-কারখানায় পণ্য উৎপাদিত হলেও তা বাজারে বিক্রি হচ্ছে না। তা হলে উপায় কী? উপায় তো হল, যাতে দেশের বেশির ভাগ মানুষের কেনার ক্ষমতা বাড়ে, তার ব্যবস্থা করা। অর্থাৎ নানা উপায়ে সাধারণ মানুষের হাতে টাকার জোগান বাড়ানো। বাস্তবে তা না করে সরকার পুঁজিপতিদের থলিতেই আরও টাকা ঢেলে চলেছে। যেন পুঁজিপতিদের পকেটে টাকা ঢাললে সাধারণ মানুষের কেনার ক্ষমতা বাড়বে! উল্টে রেল, মোটরগাড়ি, টেলিকম সহ প্রায় সমস্ত শিল্পে লাখে লাখে কর্মরত মানুষকে মালিকরা ছাঁটাই করে চলেছে। এর দ্বারা এই চরম মন্দার সময়ে, যখন দেশের বেশির ভাগ মানুষের দুবেলা পেটভরে খাবার জোগাড় করাই মুশকিল হয়ে যাচ্ছে, তখন পুঁজিপতিরা কিন্তু তাদের মুনাফা বাড়িয়েই চলেছে।

এই ভাবে পুঁজিপতিদের ছাড় দিতে দিতে সরকারি কোষাগারের যখন হাঁড়ির হাল, তখন আবার সেই ঘাটতি মেটাতে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে নির্বিচারে বেচে দিয়ে কোষাগার ভরাচ্ছে। এর দ্বারা একদিকে সরকার মন্দার সংকটে ভুগতে থাকা পুঁজিপতিদের জলের দামে লাভজনক সংস্থাগুলি দিয়ে তাদের সহজে মুনাফা বাড়ানোর রাস্তা করে দিচ্ছে, অন্য দিকে যতটুকু হোক সেই টাকায় কোষাগার ভরছে আবারও তাদেরই সেবা করার জন্য। কিন্তু জনগণের টাকায় গড়ে ওঠা সরকারি সম্পত্তিগুলি এই ভাবে বেচে দেওয়ার অধিকার বিজেপি নেতারা পেলেন কোথায়? তাঁরা সরকারের মন্ত্রী হয়েছেন মানে কি জনগণ তাঁদের যা খুশি করার অধিকার দিয়েছে? না দেয়নি। তাঁরা আসলে জনমতকে দু'পায়ে মাড়াচ্ছেন। কংগ্রেসের থেকেও আরও নিপুণ ভাবে বুর্জোয়া তথা পুঁজিপতি শ্রেণির সেবা করে চলেছে বিজেপি। তাই কর্পোরেট পুঁজিপতিরা বিজেপিকে জেতাতে এবারের লোকসভা নির্বাচনেও গত নির্বাচনের মতো হাজার হাজার কোটি টাকা ঢেলেছিল। স্বাভাবিক ভাবেই বিজেপি ক্ষমতায় বসা মানে শিল্পপতিদের 'আচ্ছে দিন' আর সাধারণ মানুষের ঘোর দুর্দিন। তাই বিজেপি সরকার শিল্পপতি-পুঁজিপতিদের জন্য দেদার করছাড়, করফাঁকি, ব্যাঙ্কঋণ মকুব, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে জলের দামে তাদের হাতে তুলে দেওয়ার কাজ করে চলেছে। বিপরীতে জনগণের জীবনে মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, ছাঁটাই, ফসলের ন্যায্য দাম না পাওয়ার মতো মারাত্মক বোঝা চেপেই চলেছে। কিন্তু এ কথা স্পষ্ট যে, মানুষের আচ্ছে দিনের মোহ দ্রুত কেটে যাচ্ছে। 'সবার বিকাশে'র মুখোশের আড়ালে থাকা আসল মুখ ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তারই প্রতিফলন ঘটছে দেশজুড়ে শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষের ক্রমাগত বাড়তে থাকা বিক্ষোভগুলির মধ্যে।

কলেজ ছাত্ররা হোমওয়ার্ক আউটসোর্স করছে

পরীক্ষায় টোকাটুকি নানা দেশে হয়, আমাদের দেশেও পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে এই চিত্র দেখা যায় বছর বছর। কিন্তু পরীক্ষার আগেই টোকাটুকি! আগে থেকেই অনলাইনে বুক করা পরীক্ষা পাশের উত্তরপত্র কিংবা গবেষণাপত্র তৈরি হয়ে জমা পড়ে যাচ্ছে। শুধু সার্টিফিকেটটা নিলেই হল। তাহলেই পড়াশোনা না করে, কোনও বিষয়ে চর্চা না করে ডিগ্রি পেয়ে যাবে ছাত্ররা। ছাত্রদের হোমওয়ার্কও অনলাইনে অর্ডার দিলে করে দিচ্ছে কিছু বেকার যুবক-যুবতী, তাদেরও অধিকাংশ ছাত্র। অবশ্যই অর্থের বিনিময়ে। অর্থাৎ, কিছু ছাত্রের হোমওয়ার্ক আউটসোর্স করছে অন্য একদল ছাত্র। 'উন্নয়নশীল' দেশ বলে পরিচিত কেনিয়া, ইউক্রেনের পাশাপাশি ভারতেও এমন 'শিল্পের' চর্চা চলছে।। এরকম হোমওয়ার্কের সাপ্লাই আসছে 'উন্নত' দেশ বলে পরিচিত আমেরিকা, ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার কলেজ ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে। এ ধরনের প্রবন্ধ লিখিয়েরা মাসে ২০০০ ডলার পর্যন্ত আয় করেন বলে জানালেন কেনিয়ার এক ছাত্রী। 'আমি জানি এটা প্রতারণা। কিন্তু বেঁচে থাকার জন্য অর্থ রোজগার করতে আর কিছু করার ছিল না'— বললেন কেনিয়ার নায়েরির এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী মেরি মুগুয়া। তার টিউশন ফি বাকি পড়ে গিয়েছিল, বাড়ি ভাড়াও বাকি। অগত্যা সে বিমা কোম্পানির কাজে ঢোকে। কিন্তু বেশিদিন টেকেনি এই কাজ। তারপর হোটেলের রিসেপশনে ঢুকেও মাইনে পাচ্ছিল না ঠিকমতো। এই অবস্থায় এক বন্ধু এই লোভনীয় কাজের সন্ধান দেয়। বাধ্য হয়ে এই অসৎ কর্মে লিপ্ত হয় সে।

শুধু মেরি নয়, ফেসবুকে একটা গ্রুপেরই সদস্য এরকম ৫০ হাজারের বেশি লিখিয়ে আছেন কেনিয়াতে। এই ধরনের প্রবন্ধ বা শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয় লিখিয়েদের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। এটা একটা 'শিল্পে' পরিণত হয়েছে। ইংরেজিতে ভাল করে কথা বলতে পারেন এরকম কলেজ ছাত্ররা দ্রুত ইন্টারনেট ব্যবহার করে অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের হোমওয়ার্ক করে দিয়ে কিংবা রিসার্চের জন্য পেপার তৈরি করে দিয়ে টাকা রোজগারের পথে নেমেছেন। শিক্ষকরা এ নিয়ে অত্যন্ত চিন্তিত। একজন গবেষক জানিয়েছেন, প্রতি বছর অনলাইনে এ ধরনের লক্ষ লক্ষ অর্ডার আসে বিশ্বের নানা জায়গা থেকে।

উত্তর আমেরিকার একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, কলেজ ছাত্রদের ৭ শতাংশ স্বীকার করেছে তারা অন্য কাউকে দিয়ে পেপার তৈরি করেছে, ৩ শতাংশ স্বীকার করেছে তারা 'এসে মিল' থেকে প্রবন্ধ লিখিয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়া, সান দিয়াগো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর ট্রিসিয়া বারট্রাম গ্যালান্ট আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, 'এই মারাত্মক সমস্যার মোকাবিলায় আমরা যদি কিছু না করি, তাহলে প্রতিটি স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় এক একটি 'ডিপ্লোমা দেওয়ার কারখানায়' পরিণত হবে। চুক্তির ভিত্তিতে প্রতারণা আমেরিকার ১৭টি রাজ্যে বেআইনি, কিন্তু শাস্তি হয় লঘু। বিশেষজ্ঞদের মতে, আমেরিকা কিংবা কেনিয়াতে অ্যাকাডেমিক পেপার কেনা বা বেচা নিষিদ্ধ করার কোনও আইনি ব্যবস্থা নেই।

আমেরিকা, ইংল্যান্ডের মতো দেশের শিক্ষার মান নিয়ে বিশ্ববাসী গর্ব করত এক সময়! শিক্ষার ব্যবসায়ীকরণ, শিক্ষা-বাণিজ্য আজ তাদের শিক্ষার হালকে এই জায়গায় ঠেলে দিয়েছে। শিক্ষায় বেসরকারি বিনিয়োগ তাকে লাভজনক পণ্যে পরিণত করেছে। পুঁজিবাদী সমাজের অনিবার্য নিয়মে যে কোনওভাবে সর্বোচ্চ মুনাফা লাভের লালসায় কোনও নীতি শিক্ষা-বাজারের মালিকরা মানে না। তার অবশ্যম্ভাবী ফল বর্তেছে শিক্ষার সর্বাঙ্গে। মানবসভ্যতার কাছে এই মুনাফাভিত্তিক সর্বগ্রাসী বাজারি ব্যবস্থা কত বড় সর্বনাশা— এ ঘটনা আবার তা দেখাল।

শাসকশ্রেণির ষড়যন্ত্র

একের পাতার পর

সংশয় প্রকাশ করে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছে— (১) দিনের আলোয় না করে কেন পুনর্নির্মাণের ঘটনা গভীর রাতে, নিরপেক্ষ সাক্ষীদের অনুপস্থিতিতে করা হল? (২) দশ জন সশস্ত্র পুলিশের উপস্থিতিতে কী করে একজন নিরস্ত্র অপরাধী এক পুলিশের রিভলবার কেড়ে নিয়ে গুলি চালিয়ে পালানোর চেষ্টা করতে পারল? (৩) পুলিশের গুলিতে চার অপরাধীর মৃত্যু হল, অথচ একজনও পুলিশ কর্মীর শরীরে গুলির আঘাত হল না কেন? (৪) আত্মরক্ষার প্রয়োজনে গুলি চালাতে হয়ে থাকলে পুলিশ কেন অপরাধীদের হাঁটুর নিচে গুলি চালালো না? এসব প্রশ্ন থেকেই মানুষের অনুমান, নিজেদের পূর্বেকার অপদার্থতা ও অবহেলা চাপা দিয়ে জনগণের চোখে 'হিরো' সাজার চেষ্টাতেই হয়তো এক্ষেত্রে পুলিশ ভুয়ো সংঘর্ষ ঘটিয়েছে। আমাদের দেশে ইতিপূর্বে বেশ কিছু ভুয়ো সংঘর্ষের ঘটনা থাকায় মানুষের এই অনুমান আরও জোরদার হয়েছে।

আমাদের দাবি, সত্য প্রকাশের জন্য বিচারবিভাগীয় তদন্ত হোক এবং যদি পুলিশ কর্মীরা দোষী প্রমাণিত হন, তাহলে তাঁদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক। আমাদের আরও দাবি, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলিকে অতি অবশ্যই মহিলাদের নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং ধর্ষণ ও হত্যায় অপরাধীদের তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করে দ্রুত বিচার করতে ও কঠিন শাস্তি দিতে হবে। যৌনতা, ড্রাগ ও মদের নেশা ইত্যাদির প্রসার ঘটিয়ে মানুষকে 'অমানুষ' করার শাসক দলগুলির ষড়যন্ত্র ক্রমাগত ঘটে চলা ধর্ষণ-হত্যার মতো ঘটনাগুলির মূল কারণ। এর বিরুদ্ধে দেশজোড়া গণআন্দোলন গড়ে তুলতে জনগণের প্রতি আমরা আহ্বান জানাচ্ছি।

সাম্যবাদের মূল নীতি

ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস

১৮৪৭ সালে কমিউনিস্ট লিগের প্রতিষ্ঠা সম্মেলনে একটি কর্মসূচি তৈরির সিদ্ধান্ত হয়। রচনার দায়িত্ব নেন লিগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস। প্রথম খসড়াটির নাম রাখা হয়েছিল, 'ড্রাফট অফ এ কমিউনিস্ট কনফেশন অফ ফেথ'। এই খসড়াটির কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। প্রশ্নোত্তরে লেখা বর্তমান রচনাটি দ্বিতীয় খসড়া রূপে এঙ্গেলস তৈরি করেন। কমিউনিজমের আদর্শকে সহজ ভাষায় বোঝাবার জন্য প্রশ্নোত্তর রূপে লিখলেও, এঙ্গেলস এতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। ১৮৪৭-এর ২৩ নভেম্বর মার্কসকে এক চিঠিতে তিনি লেখেন— প্রশ্নোত্তরে লেখাটার উপর একটু ভাবনা-চিন্তা কোরো। আমার মনে হয়, এভাবে চলবে না। ইতিহাসের ঘটনাবলি কিছু যুক্ত করেই এটা দাঁড় করাতে হবে এবং নামও হওয়া উচিত 'কমিউনিস্ট ইস্তাহার'। ১৮৪৮ সালেই প্রকাশিত হয় মার্কস-এঙ্গেলস রচিত সেই কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো বা ইস্তাহার। সুতরাং বর্তমান প্রশ্নোত্তরের লেখাটিকে কমিউনিস্ট ইস্তাহারের খসড়া হিসাবেই দেখতে হবে। এঙ্গেলসের ২০০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আমরা লেখাটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এবার দ্বিতীয় কিস্তি।

প্রশ্ন ঃ কারিগরদের সাথে সর্বহারার পার্থক্য কোথায় ?

উত্তর ঃ সর্বহারার বিপরীতে তথাকথিত যে কারিগর (হস্তশিল্পী) সম্প্রদায়কে গত শতাব্দীতে (অষ্টাদশ) প্রায় সর্বত্র দেখা যেত এবং এখনও স্থানে স্থানে তাদের পাওয়া যায়, তারা বড়জোর সাময়িকভাবে সর্বহারা। তাদের লক্ষ্য থাকে নিজস্ব পুঁজি সঞ্চয় করার, যার মাধ্যমে অন্য মজুরদের শোষণ করা যায়। এই লক্ষ্য পূরণ তাদের পক্ষে সম্ভব— যেখানে এখনও কারিগরদের গিল্ডের অস্তিত্ব আছে অথবা যেখানে গিল্ডের প্রভাবমুক্ত স্বাধীন পেশায় থাকা কারিগরদের উৎপাদন এখনও কারখানা ভিত্তিতে সংগঠিত হয়নি এবং সে কারণে এখনও হিংস্র প্রতিযোগিতার মুখে পড়তে হয়নি। কিন্তু যে মুহূর্তে কারুশিল্প কারখানা-উৎপাদন ব্যবস্থার অন্তর্গত হল এবং প্রতিযোগিতা পুরোপুরি মাথা তুলল, আগের পরিস্থিতি ক্রমাগত লুপ্ত হয়ে কারিগররা বেশি বেশি করে সর্বহারায় রূপান্তরিত হতে লাগল। এইভাবে কারিগররা হয় নিজেরাই বুর্জোয়ায় পরিণত হয়ে, অথবা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মধ্যবিত্তে পরিণত হয়ে নিজেদের মুক্ত করল। আর না হলে প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়ে তারা পরিণত হল সর্বহারায় (আজকের দিনে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যা ঘটছে)। এই অবস্থায় তারা সর্বহারা আন্দোলনে যোগ দিয়ে যথার্থ মুক্তি অর্জন করতে পারে— যা বলতে গেলে বাস্তবে কমিউনিস্ট আন্দোলন।

(এই প্রশ্নটির উত্তরের জায়গাটি এঙ্গেলস খসড়ায় ফাঁকা রেখেছিলেন। কিন্তু এই রচনার ঠিক আগে লেখা 'ড্রাফট অফ এ কমিউনিস্ট কনফেশন অফ ফেথ'-এ ১২ নম্বর প্রশ্ন এবং উত্তরটি ছিল হুবহু এক। সেটিই এখানে দেওয়া হল। সূত্র ঃ কার্ল মার্কস -ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস কালেক্টেড ওয়ার্কস, ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স নিউইয়র্ক, ১৯৭৬)

প্রশ্ন ঃ প্রাক-শিল্পবিপ্লব ক্ষুদ্র উৎপাদন শ্রমিকদের (ম্যানুফ্যাক্টরি শ্রমিক) সঙ্গে সর্বহারাদের তফাৎ কোথায় ?

উত্তর ঃ সামান্য কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে, ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকের ম্যানুফ্যাক্টরি শ্রমিকদের হাতে কিছু উৎপাদনের হাতিয়ার যেমন, নিজস্ব তাঁত, পারিবারিক সুতা কাটার যন্ত্র, অবসর সময়ে চাষবাস করা চলে এমন ছোট একখণ্ড জমি— এসব ছিল এবং এখনও কোথাও কোথাও তা আছে। সর্বহারার এসব কিছুই নেই।

ম্যানুফ্যাক্টরি শ্রমিকেরা মূলত গ্রামাঞ্চলে বাস করত এবং জমিদার বা নিয়োগকারীদের সঙ্গে খানিকটা পিতৃতান্ত্রিক সম্পর্কে আবদ্ধ ছিল। সর্বহারা মূলত শহরবাসী এবং নিয়োগকারীর সঙ্গে তার সম্পর্ক নিখাদ আর্থিক।

বৃহৎ শিল্প ম্যানুফ্যাক্টরি শ্রমিককে তার এই পিতৃতান্ত্রিক সম্পর্ক থেকে ছিন্ন করল শুধু নয়, তার সামান্য যা নিজস্ব সম্পত্তি ছিল, এর ফলে তাও সে হারাল এবং এভাবেই পরিণত হল সর্বহারায়।

প্রশ্ন ঃ শিল্প-বিপ্লব এবং বুর্জোয়া আর সর্বহারার মধ্যে সমাজ বিভক্ত হয়ে যাওয়ার তাৎক্ষণিক ফলাফল কী হয়েছিল ?

উত্তর ঃ প্রথমত, যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদনের ফলে শিল্পজাত দ্রব্য সমানে সস্তা হয়ে যেতে থাকল। ফলে, কায়িক শ্রমের ভিত্তিতে চলা ক্ষুদ্র উৎপাদন শিল্পের (ম্যানুফ্যাক্টরি) পুরনো প্রণালীটা পৃথিবীর সমস্ত দেশে পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেল। যে সকল অর্ধসভ্য (সেমি বারবারিয়ান) দেশ তখনও পর্যন্ত এই ঐতিহাসিক অগ্রগতির ধারা থেকে কিছুটা হলেও বিচ্ছিন্ন ছিল এবং তাদের উৎপাদন পদ্ধতি তখনও পুরনো উৎপাদন প্রণালীতে চলত, তাদের বিচ্ছিন্নতার গণ্ডি থেকে বলপূর্বক উচ্ছেদ করা হল। ব্রিটিশের অপেক্ষাকৃত সস্তা পণ্যদ্রব্য কেনার মাধ্যমে নিজেদের ক্ষুদ্র উৎপাদন-শ্রমিকদের ধ্বংস হয়ে যেতে দিতে হল তাদের। হাজার হাজার বছরেও যে সব দেশে প্রগতির চিহ্ন দেখা যায়নি—যেমন, ভারতবর্ষ—সেখানেও আগাগোড়া বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে গেল, এমনকি, চীনও বিপ্লবের পথে হাঁটা শুরু করল।

আজ এমন এক পরিস্থিতি এসেছে যে, ইংল্যান্ডে উদ্ভাবিত একটা যন্ত্র বছরখানেকের মধ্যে চীনের লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে কর্মহীন করে দেয়।

বৃহদায়তন শিল্প এইভাবে পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে একটা সম্পর্কের মধ্যে টেনে এনেছে। ছোট ছোট সমস্ত স্থানীয় বাজারকে জুড়ে দিয়েছে বিশ্ব-বাজারে, সভ্যতা আর প্রগতির পথ সুগম করেছে সর্বত্র। উন্নত দেশগুলির ঘটনা প্রবাহের দ্বারা যাতে দুনিয়ার সমস্ত দেশ প্রভাবিত হয় সেই ব্যবস্থা করেছে।

তাই আজ ইংল্যান্ড কিংবা ফ্রান্সের শ্রমিকরা মুক্তি অর্জন করলে তা নিশ্চিতভাবে বিশ্বের সমস্ত দেশের শ্রমিককে বিপ্লবের রাস্তা দেখাবে। আজ হোক আর কাল বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এই সমস্ত দেশের শ্রমিক মুক্তি অর্জনে সফল হবেই।

দ্বিতীয়ত, যেখানেই ক্ষুদ্র শিল্পকে হটিয়ে তার জায়গায় বৃহদায়তন শিল্প এসেছে, সেখানেই শিল্প বিপ্লব বুর্জোয়াদের উন্নতির শিখরে নিয়ে গেছে। তাদের সম্পদ ও ক্ষমতাকে সর্বোচ্চ জায়গায় নিয়ে গেছে, তাদের প্রধান শ্রেণি হিসাবে গড়ে তুলেছে। তার ফল হয়েছে, যেখানেই এই ঘটনা ঘটেছে সেখানে বুর্জোয়ারা রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করেছে এবং উচ্ছেদ করেছে পূর্বতন সমস্ত শাসক শ্রেণি—অভিজাতকুলকে, গিল্ডের মনিবদের এবং এই দু'য়ের প্রতিভূ নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রকে।

সম্পত্তির উত্তরাধিকারকে বংশানুক্রমে কুক্ষিগত করে রাখার অধিকারকে বাতিল করে এবং ভূমি-সম্পত্তিকে ক্রয়-বিক্রয়ের যোগ্য করে দিয়ে, উচ্চবর্গীয়দের সমস্ত বিশেষ অধিকার লোপ করে বুর্জোয়ারা অভিজাত এবং উচ্চবর্গীয়দের ক্ষমতা চূর্ণ করেছিল। গিল্ডগুলিকে এবং হস্তশিল্পীদের বিশেষ অধিকারকে লোপ করে বুর্জোয়ারা গিল্ড মালিকদের ক্ষমতা চূর্ণ করেছিল। তাদের জায়গায় তারা এনেছিল অবাধ প্রতিযোগিতা, অর্থাৎ এমন এক সামাজিক ব্যবস্থা যেখানে যে কোনও ব্যক্তির অধিকার রয়েছে তার পছন্দমতো শিল্পের যে কোনও শাখায় প্রবেশ করার। এ কাজে আবশ্যক পুঁজির অভাব ছাড়া অন্য কোনও কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।

অবাধ প্রতিযোগিতার প্রবর্তন সর্ব সমক্ষে ঘোষণা করে দিল— এখন থেকে সমাজের সভ্যদের মধ্যে একটিমাত্র বৈষম্যই বিরাজ করবে, তা হল, তাদের হাতে সঞ্চিত পুঁজির পরিমাণের বৈষম্য। পুঁজিই হয়ে উঠল ক্ষমতার নির্ণায়ক শক্তি, তাই পুঁজির মালিক বুর্জোয়াশ্রেণিই হয়ে উঠল সমাজের সর্বপ্রধান শ্রেণি। বৃহৎ শিল্পের সূচনার সময়ে অবাধ প্রতিযোগিতা ছিল প্রয়োজনীয় শর্ত, কারণ একমাত্র এই সামাজিক অবস্থার মধ্যেই বৃহদায়তন শিল্প বিস্তার লাভ করতে পারে।

অভিজাতবর্গ আর গিল্ড মালিকদের সামাজিক ক্ষমতা চূর্ণ করার সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়ারা চূর্ণ করল তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতাও। সমাজে সর্বপ্রধান শ্রেণি হয়ে ওঠার সাথে সাথে বুর্জোয়ারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও সর্বপ্রধান শ্রেণি হিসাবে নিজেদের ঘোষণা করল। তারা এ কাজ করল প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এই শাসনব্যবস্থার মূল অবলম্বন হল— বুর্জোয়া সাম্যের ধারণার ভিত্তিতে আইন ও অবাধ প্রতিযোগিতার আইনি স্বীকৃতি। ইউরোপের দেশগুলিতে এই শাসনব্যবস্থা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সব নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের দেশে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পুঁজির মালিকেরাই, অর্থাৎ কেবলমাত্র বুর্জোয়ারাই ভোটদানের অধিকারী। এই বুর্জোয়া ভোটাররাই ডেপুটিদের নির্বাচন করে, এবং এই বুর্জোয়া ডেপুটিরা কর দিতে অস্বীকার করার অধিকার প্রয়োগ করে নির্বাচন করে একটি বুর্জোয়া সরকার।

তৃতীয়ত, শিল্প বিপ্লব যেমন বুর্জোয়াদের সৃষ্টি করেছে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সৃষ্টি করেছে সর্বহারাদের। যে-মাত্রায় বুর্জোয়াদের সম্পদবৃদ্ধি ঘটেছে, সেই মাত্রায় সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে সর্বহারাদের। যেহেতু একমাত্র পুঁজিই সর্বহারাকে কাজে নিয়োগ করতে পারে, আবার পুঁজি কেবল তখনই বাড়তে পারে যখন সে নিযুক্ত করে শ্রম, তাই সর্বহারার বৃদ্ধি ঘটে ঠিক পুঁজির বৃদ্ধির সঙ্গে সমান তালে। একই সঙ্গে শিল্প-বিপ্লব বুর্জোয়া এবং সর্বহারা উভয়কেই জড়ো করে বড় বড় শহরে, যেখানে শিল্প চালানো সবচেয়ে লাভজনক। একই জায়গায় এই বিপুল জনসমষ্টির একত্রিত হওয়ার ঘটনা সর্বহারাদের তাদের ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। এই ব্যবস্থা যত অগ্রসর হয়, তত বেশি করে উদ্ভব হয় শ্রম-সাশ্রয়কারী যন্ত্রের, যা ক্রমাগত উচ্ছেদ করে কায়িক শ্রমকে, ততই তা মজুরিকে নামিয়ে নিয়ে যায় একেবারে ন্যূনতম জায়গায়, যা সর্বহারাদের জীবনকে ক্রমাগত অসহনীয় করে তোলে। একদিকে সর্বহারাদের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ এবং অন্যদিকে তাদের উত্তরোত্তর শক্তিবৃদ্ধি সর্বহারা সমাজ-বিপ্লবের পথ প্রস্তুত করে তোলে।

প্রশ্ন ঃ শিল্প-বিপ্লবের অন্যান্য ফলাফল কী ?

উত্তর ঃ স্টিম ইঞ্জিন এবং অন্যান্য যন্ত্রের সাহায্যে বৃহদায়তন শিল্প অতিদ্রুত এবং স্বল্প খরচে উৎপাদনকে সীমাহীনভাবে বাড়িয়ে চলার উপায় আয়ত্ত করল। উৎপাদনের স্বচ্ছন্দতার কল্যাণে অবাধ প্রতিযোগিতা, যা বৃহদায়তন শিল্পের অবশ্যম্ভাবী ফল, তা অচিরেই চরম মাত্রায় তীব্র হয়ে উঠল। বহুসংখ্যক পুঁজিপতি লেগে গেল শিল্পে, অল্প সময়ের মধ্যেই উৎপাদন হতে থাকল প্রয়োজনের তুলনায় বেশি। উৎপাদিত পণ্যের বিক্রির উপায় থাকল না। ফলে দেখা দিল তথাকথিত এক বাণিজ্যিক সংকট। কল-কারখানা বন্ধ করে দিতে হল। সেগুলির মালিকেরা হল দেউলিয়া, শ্রমিকদের অন্ন ঘুচল। সর্বত্র ঘনিয়ে এল শোচনীয় দুর্দশা। কিছুকাল পরে উদ্বৃত্ত উৎপাদন বিক্রি হল। কল কারখানাগুলি আবার চলতে শুরু করল, মজুরি বাড়ল, আগের চেয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে এল তেজিভাব। কিন্তু বেশি দিন গেল না। আবার পণ্য উৎপন্ন হতে থাকল বড় বেশি, আরও একটা নতুন সংকট ছড়িয়ে পড়ল এবং আগেরটার পথেই তা এগোতে থাকল। এইভাবে, এই শতাব্দীর (ঊনবিংশ) শুরু থেকে শিল্প পর্যায়ক্রমে কখনও বাড়বাড়ন্ত কখনও সংকটের আবর্তের মধ্যে ওঠা-পড়া করেছে অবিরাম। প্রায় প্রতি পাঁচ থেকে সাত বছর অন্তর নতুন সংকটের প্রাদুর্ভাব ঘটে, যা সব সময় বয়ে নিয়ে এসেছে শ্রমিকদের আরও অবর্ণনীয় দুর্গতি এবং একই সাথে নিয়ে এসেছে সর্বব্যাপক বৈপ্লবিক আলোড়ন, আর প্রচলিত পুরো ব্যবস্থার জন্য চূড়ান্ত বিপদ।

প্রশ্ন ঃ পর্যায়ক্রমে ফিরে আসা এইসব বাণিজ্যিক সংকটের পরিণতি কী ?

উত্তর ঃ প্রথমত, বৃহদায়তন শিল্প তার বিকাশের প্রারম্ভিক পর্বে নিজেই অবাধ প্রতিযোগিতার জন্ম দিলেও এই শিল্পের বৃদ্ধি এখন অবাধ প্রতিযোগিতার পরিধি ছাপিয়ে গেছে। একদিকে প্রতিযোগিতা অন্যদিকে ব্যক্তিমালিকানায় শিল্পোৎপাদন বৃহদায়তন শিল্পের পায়ে বেড়ির মতো জড়িয়ে গেছে। এই শৃঙ্খলকে শিল্পের অবশ্যই ভাঙা চাই এবং তা সে ভাঙবেই। যতদিন বৃহদায়তন শিল্প বর্তমান ভিত্তিতে চলবে, তা চলতে পারে শুধু সাত বছর অন্তর-অন্তর পুনরাবৃত্ত সর্বব্যাপক বিশৃঙ্খল অবস্থার ভিতর দিয়ে। এই অবস্থা শুধু সর্বহারাদের চরম দুর্দশার আবর্তে ঠেলে দেয় না, একই সাথে তা ধ্বংস করে বিরাট সংখ্যক বুর্জোয়াকে এবং এর মধ্য দিয়ে তা বারে বারে বিপন্ন করে সমগ্র সভ্যতাকে। ফলে সমাজকে হয় বৃহদায়তন শিল্প ত্যাগ করতে হবে, যা একেবারেই অসম্ভব, নইলে সমাজকে অনিবার্যভাবে সংগঠিত করতে হবে সম্পূর্ণ নতুন রূপে— যেখানে শিল্পোৎপাদন পরিচালিত হয় পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তি-মালিকদের দ্বারা

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্পর্ধায় এগিয়ে আসুক সহস্র অনু

দিল্লির কুড়ি বছরের মেয়েটি, অনু দুবে, সংসদের ফটকের উল্টো দিকের ফুটপাতে একা বসেছিল একটি প্ল্যাকার্ড হাতে। তাতে লেখা, 'কেন আমি আমার ভারতে নিরাপদ নই?' কোনও স্লোগান সে তোলেনি, কোথাও ঢোকার চেষ্টাও করেনি। কিন্তু পুলিশ এসে টেনে হিঁচড়ে তাকে তুলে নিয়ে গেল থানায়। সেখানে লোকচক্ষুর আড়ালে তার উপর চলল মারধর। নখ দিয়ে আঁচড়ে দেওয়া হল সারা শরীর।

কী ছিল তার অপরাধ? একান্ত নিজের অনুভূতি থেকে যে মূল্যবান প্রশ্নটি তুলে ধরতে গিয়েছিল সে, সেটা ছিল আজকের ভারতের সমগ্র নারী সমাজের নিরাপত্তার প্রশ্ন। এই সামান্য প্রতিবাদটুকুই ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল প্রশাসনে। স্ফুলিঙ্গ থেকেই যে দাবানল তৈরি হয়!

মাত্র দিন কয়েক আগে হায়দরাবাদের তরুণী চিকিৎসককে পরিকল্পিতভাবে অপহরণ ও গণধর্ষণ করে চারজন মদ্যপ যুবক। তারপর প্রমাণ লোপাট করতে তাকে খুন করে দেহে পেট্রল দিয়ে জ্বালিয়ে দেয় তারা। এই হাড়-হিম-করা ঘটনা অনু দুবের মতো গোটা নারীসমাজের মনে গভীর উদ্বেগ জাগিয়ে তুলেছে। তাঁরা অসহায় বোধ করছেন। অসহায় বোধ করছেন নিজের এবং নারীসমাজের প্রতিদিনের নিরাপত্তা নিয়ে।

এরই মধ্যে এল ১৬ ডিসেম্বর। ২০১২ সালের এই দিনটিতে দিল্লির এক প্যারা মেডিকেল ছাত্রী দুষ্কৃতীদের পাশবিক অত্যাচারের শিকার হয়েছিল। অপরিসীম যন্ত্রণা নিয়ে মাত্র তেরো দিন সে বেঁচেছিল। কিন্তু ওই অবস্থাতেও ঘটনার প্রতিবাদ করে, দুষ্কৃতীদের শাস্তি চেয়ে সমাজের কাছে তার শেষ আকুতি ঝড় তুলেছিল সারা দেশে। প্রবল শীত উপেক্ষা করে দিল্লির যন্তরমন্তর তিন দিন তিন রাত অবরুদ্ধ হয়েছিল। দিল্লি প্রশাসন রক্তচক্ষু দেখিয়ে জলকামান চালিয়েও সেই অবরোধকে ভাঙতে পারেনি। দেশের মানুষ সেই তরুণীর নাম দিয়েছিল 'নির্ভয়া'। ৩০ নভেম্বর অনু দুবের নিঃসঙ্গ-নীরব প্রতিবাদে প্রশাসন সেই ঝড়েরই পূর্বাভাস দেখেছিল।

২০১২ সালে দিল্লির মসনদে ছিল কংগ্রেস সরকার। সে সময়ে দীর্ঘদিনের উপেক্ষিত নারী নিরাপত্তার দাবিতে আন্দোলনে উত্তাল হয়েছিল দেশ। পরবর্তীকালে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় বসেছে, স্লোগান তুলেছে 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও'। কিন্তু নারীর নিরাপত্তা সুরক্ষিত হয়নি।

উত্তরপ্রদেশের উন্নাওয়ে, গোয়ায়, বিজেপির নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই অভিযুক্ত, শ্রীনগরের কাঠুয়ায় বিজেপি বিধায়ক প্রকাশ্যে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ছড়িয়ে অভিযুক্তদের সমর্থনে মিছিল করে। গোটা দেশে লাগামহীনভাবে বেড়ে যাওয়া নারী ধর্ষণ ও শিশু ধর্ষণের ঘটনা, একের পর এক নৃশংস হত্যার ঘটনা মানুষের বিবেককে অস্থির করে তুলছে।

আইন আছে, প্রশাসন আছে, মানুষের প্রতিবাদ আছে, তা সত্ত্বেও এই ঘটনার রাশ টানা যাচ্ছে না কেন? আসলে, গোটা সমাজটা দাঁড়িয়ে আছে অন্যায়ের উপর। সরকার ও প্রশাসনের সদিচ্ছা নেই আক্রান্ত-ধর্ষিতা অসহায় নারীদের পাশে দাঁড়াতে। তাই রাতের অন্ধকারে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাতেও থাকে না পর্যাপ্ত পুলিশি নজরদারি। থানায় গেলে আক্রান্তদের পাশে থাকার বদলে চলে অসহযোগিতা। দুষ্কৃতী ও তার দলবলের হুমকির মুখে জোটে না প্রশাসনের নিরাপত্তা। পুলিশের যথাযথ উদ্যোগের অভাব ও কোর্টের বিচারের দীর্ঘসূত্রতায় অপরাধীর শাস্তি যতদিনে হয়, ততদিনে ঘটনার স্মৃতি মানুষের মন থেকে মুছে গেছে। বহু সময় অপরাধী ছাড়া পেয়ে যায়।

সরকার রাজস্ব আদায়ের অজুহাতে মদের ঢালাও লাইসেন্স দিয়ে এলাকায়, এলাকায় দুষ্কৃতী তৈরি করে চলেছে। আর দুষ্কৃতীরাই তো ভোটসর্বস্ব রাজনৈতিক দলগুলির শক্তির উৎস। তাই তারা যাতে শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে যায়, তার জন্য প্রশাসনের উপর চাপ থাকে। প্রশাসন এদেরই অঙ্গুলিহেলনে কাজ করে। অনেক ক্ষেত্রেই পুলিশের মধ্যস্থতায় স্থানীয় প্রভাবশালীদের নির্দেশে টাকার বিনিময়ে ঘটনা চাপা দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলে।

আজ ক্ষয় ধরা এই পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ অর্থনৈতিক সামাজিক নানা নিষ্পেষণে জর্জরিত। মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, ছাঁটাই, লক-আউট, কৃষকের রোজগারহীনতায় মানুষ ব্যতিব্যস্ত। তরুণ প্রজন্মের সামনে নেই প্রকৃত শিক্ষার সুযোগ, নেই ভবিষ্যৎ জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলার কোনও সুস্পষ্ট দিশা, নেই সামাজিক উন্নত আদর্শ, নীতিনৈতিকতা, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ। আছে অপরাধ জগতের হাতছানি, মদেরও ঢালাও ব্যবস্থা, শাসকদলের রাজনৈতিক প্রশ্রয়। শাসক শ্রেণির আড়কাঠিরা আমাদের ঘরের ছেলেদেরই ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, করে তুলছে অমানুষ। একে রুখতেই হবে।

পেঁয়াজ সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে বহরমপুরে বিক্ষোভ-মিছিল

বাজারে আলু পেঁয়াজ থেকে শুরু করে সবজির দামে আগুন। আলু ২০-২৫ টাকা, পেঁয়াজ ১৫০-১৬০ টাকা। বিপর্যস্ত মানুষ বাজারে গিয়ে নাজেহাল। ন্যূনতম প্রয়োজনীয় জিনিসটুকু কিনে উঠতে পারছেন না। প্রতিদিন কী খাবার পাতে দেবেন — এই দুশ্চিন্তা। কেন্দ্র কিংবা রাজ্য সরকার উভয়ই নীরব। অথচ ফসল যখন উঠেছে চাষি তখন দাম পাননি। ঋণগ্রস্ত চাষি ২ টাকা কেজি দরে আলু, ৪-৫ টাকা কেজি দরে পেঁয়াজ বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন। জলের দরে কিনে এখন চলছে ফড়ে, আড়তদার, মহাজনদের কারসাজি। বিপুল মুনাফা ঘরে তুলছে মজুতদার আড়তদাররা। তাদের পেছনে আছে সরকারের নেতা-মন্ত্রী ও প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিদের প্রত্যক্ষ পরোক্ষ মদত।

সংবাদমাধ্যমে উঠে আসছে মহারাষ্ট্রের নির্বাচনে পেঁয়াজ-লবির বিপুল পরিমাণ টাকা খেটেছে। মরছে গরিব চাষি, গরিব-নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত ক্রেতারা। আলু পিঁয়াজ সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কমানোর দাবিতে এবং জেলায় ডেঙ্গু ও স্ক্রাব টাইফাসের প্রতিরোধের দাবিতে ২৯ ডিসেম্বর এস ইউ সি আই (সি)-র পক্ষ থেকে বহরমপুর শহরে বিক্ষোভ দেখানো হয়।

এদিন শহরের গ্র্যান্ট হল থেকে পিঁয়াজের প্রতিকৃতি হাতে নিয়ে সুসজ্জিত মিছিল জেলা প্রশাসনিক ভবনের সামনে গিয়ে বিক্ষোভ দেখায়। পরে লালদিঘির পাড় ঘুরে টেক্সটাইল মোড়ে মিছিল শেষ হয়।

জেলায় জেলায় শ্রমিক সম্মেলন

উত্তর ২৪ পরগণা ঃ ১ ডিসেম্বর এ আই ইউ টি ইউ সি-র উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সম্মেলন শ্যামনগর ভারতচন্দ্র গ্রন্থাগার হলে অনুষ্ঠিত হল। সম্মেলনে জুট, রেল, বিদ্যুৎ, সরকারি কর্মচারী, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি সংগঠিত ক্ষেত্র এবং মোটর ভ্যানচালক, আশা, আই সি ডি এস, পরিচারিকা, মিড-ডে মিল, নির্মাণ, গারমেন্টস, হকার, বিড়ি, প্রভৃতি অসংগঠিত ক্ষেত্র থেকে প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

উত্তর ২৪ পরগণা

কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী-নীতির বিরুদ্ধে বক্তারা আন্দোলনের আহ্বান জানান। সম্মেলনে নারী-নির্যাতন বিরোধী প্রস্তাব পাশ হয়। আগামী ৮ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির ডাকে সারা ভারত সাধারণ ধর্মঘট সফল করার আহ্বান জানানো হয়। কমরেড অমল সেনকে সভাপতি এবং কমরেড প্রদীপ চৌধুরীকে সম্পাদক করে ২৫ জনের কমিটি গঠিত হয়।

নদীয়া ঃ ৩০ নভেম্বর কৃষ্ণনগরে পল্লীশ্রী অফিসে অনুষ্ঠিত হল চতুর্থ নদীয়া জেলা সম্মেলন। এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অমল সেন বলেন, ব্যবসায়ীকরণ, বিলগ্নিকরণের মধ্য দিয়ে শ্রমজীবী মানুষের ওপর নির্মম আক্রমণ নেমে আসছে। বিজেপি সরকার এনআরসি-র মধ্য দিয়ে শ্রমজীবী জনগরণের ঐক্য ভাঙতে চাইছে। রাজ্য সহ- সভাপতি কমরেড সুজিত ভট্টশালী অর্থনৈতিক সুবিধাবাদকে পরাস্ত করে জনবিরোধী শ্রমিকনীতির বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড ঋতুপর্ণা মহাপাত্র।

আশা, অঙ্গনওয়াড়ি, মিড-ডে মিল কর্মী, বিড়ি, শ্রমিক, মোটর ভ্যান চালক, ওয়াটার ক্যারিয়ার ও সুইপার রাজ্য সরকারী কর্মচারীসহ বিভিন্ন অংশের শ্রমজীবী মানুষ উপস্থিত ছিলেন। কমরেড প্রবীর দেকে সম্পাদক ও কমরেড দীপক চৌধুরীকে সভাপতি করে এক নতুন জেলা কমিটি গঠিত হয়।

নদীয়া

ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের কম্বল বিতরণ

অল ইন্ডিয়া ইউকো ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের উদ্যোগে ১ ডিসেম্বর সুন্দরবনের সিতারামপুরে (জি প্লট) বুলবুল ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত গরিব মানুষের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অশোক শাসমল, কার্তিক দাস, অলোকতীর্থ মণ্ডল, পুরেন্দু বিশ্বাস, শেখর গুহ, ভাস্কর সান্যাল প্রমুখ।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১৯ বিরোধী সেমিনার মুজফফরপুরে

বিহারের মুজফফরপুরে ১ ডিসেম্বর প্রগতিশীল শিক্ষক মঞ্চের উদ্যোগে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১৯ বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ রবীন্দ্র কুমার রবি। সভাপতিত্ব করেন ডঃ বিজয় কুমার জয়সওয়াল, পরিচালনা করেন রামপ্রীত রায়। জাতীয় শিক্ষানীতি নিয়ে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন সেভ এডুকেশন কমিটির সর্বভারতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য দেবাশিস রায়। নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি কেন শিক্ষা, শিক্ষক এবং জনস্বার্থের বিরুদ্ধে, তাঁর আলোচনায় সেই বিশ্লেষণ উঠে আসে।

সেমিনারে উপস্থিত সাহিত্যিক ব্রহ্মানন্দ ঠাকুর ও শিক্ষক নেতা নাগেশ্বর প্রসাদ সিংহ জাতীয় শিক্ষানীতির ক্ষতিকর দিকগুলি তুলে ধরেন।

বিহারের নানা কলেজ ও স্কুলের অধ্যাপক-শিক্ষকরা সেমিনারে উপস্থিত থেকে তাঁদের মূল্যবান মতামত পেশ করেন।

শিক্ষা কনভেনশন জলন্ধরে

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১৯ এর প্রতিবাদে ২৪ নভেম্বর পাঞ্জাবের জলন্ধরে গদর শহিদ স্মৃতি কমপ্লেক্সে সেভ এডুকেশন কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনার সূত্রপাত করেন পাঞ্জাব সেভ এডুকেশন কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক অমিন্দার পাল সিং। বক্তব্য রাখেন দিল্লি সেভ এডুকেশন কমিটির সম্পাদক শিক্ষক গিরিবর সিং। অমৃতসর থেকে আগত বিশিষ্ট চিকিৎসক এস এস দিন্ডী এনএমসি বিলের সর্বনাশা দিক নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন।

সেভ এডুকেশন কমিটির সর্বভারতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য দেবাশিস রায় জাতীয় শিক্ষানীতির সর্বনাশা ও শিক্ষাবিরোধী দিকগুলিকে তুলে ধরে এর বিরুদ্ধে সারা দেশে শিক্ষা বাঁচাও আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। কনভেনশন সঞ্চালনা করেন শিক্ষক গুরুদীপ সিং। প্রতিনিধিদের সক্রিয় অংশগ্রহণে আলোচনা অত্যন্ত প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

কনভেনশন থেকে ১০ জনের জলন্ধর জেলা সেভ এডুকেশন কমিটি গঠিত হয় এবং জানুয়ারি মাসে অমৃতসরে 'সেভ এডুকেশন কনভেনশন' করার সিদ্ধান্ত হয়।

পেনশনের অধিকারে কোপ বসাতে চায় সরকার
ধর্মঘটে স্তব্ধ ফ্রান্স

প্যারিসের রাস্তায় প্রতিবাদী জনতার ঢেউ

৫ ডিসেম্বর। ধর্মঘটে স্তব্ধ হয়ে গেল গোটা ফ্রান্স। ৮ লক্ষেরও বেশি মানুষের বিক্ষোভ মিছিলে কেঁপে উঠল রাজধানী প্যারিস সহ দেশের অসংখ্য শহর-নগর। সরকারের শ্রমিক স্বার্থবিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ফুঁসে ওঠা ক্ষোভের এত সোচ্চার প্রকাশ গত কয়েক দশকে দেখেনি ফ্রান্সের মানুষ।

প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাকরঁ ঘোষণা করেছেন পেনশনের নিয়ম বদলানো হবে। অবসরের বয়স বাড়িয়ে দিতে চাইছেন তিনি। এতদিন ৬২ বছর বয়সে অবসর মিলত শ্রমিক-কর্মচারীদের। নতুন নিয়মে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী বাধ্য হবেন আরও বেশি বয়স পর্যন্ত কাজ করতে। না হলে হারাতে হবে অবসরকালীন নানা সুযোগ-সুবিধা। এর বিরুদ্ধে এ দিন পথে নেমেছিলেন রেল কর্মচারী, শিক্ষক, হাসপাতাল-কর্মী, ছাত্রছাত্রী সহ সর্বস্তরের শ্রমিক-কর্মচারী সাধারণ মানুষ। বন্ধ ছিল ট্রেন, বাস এমনকি বিমান পরিষেবাও। খোলেনি স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়। ফ্রান্সে গত বছর থেকে লাগাতার চলছে 'ইয়েলো ভেস্ট' আন্দোলন। এ দিন 'ইয়েলো ভেস্ট' আন্দোলনকারীরাও নানা শহরে বিক্ষোভ মিছিলে যোগ দেন। স্লোগান ওঠে— মাকরঁ গদি ছাড়ো।

বিক্ষোভ ভাঙতে যথারীতি ঝাঁপিয়ে পড়ে পুলিশ। প্যারিস সহ অন্যান্য শহরে কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়া হয়। চলে ব্যাপক ধরপাকড় ও খানাতল্লাশি। কিন্তু পিছু হঠতে রাজি নন আন্দোলনকারীরা। 'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকা ফ্রান্সের একটি শ্রমিক সংগঠন 'জেনারেল কনফেডারেশন অফ লেবার'-এর সাধারণ সম্পাদককে উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, যতদিন না সরকার পেনশনের নতুন নিয়ম প্রত্যাহার করছে, ততদিন তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।

এর আগে ১৯৯৫ সালে আরও একবার পেনশনের নিয়ম বদলাতে চেয়েছিল ফ্রান্স সরকার। সেখানকার শ্রমজীবী মানুষের দীর্ঘ লাগাতার আন্দোলনের মুখে পিছু হঠতে হয়েছিল তাদের। কিছুদিন আগে 'ইয়েলো ভেস্ট' আন্দোলনের চাপে প্রেসিডেন্ট মাকরঁ বাধ্য হন ভরতুকি বাড়িয়ে জ্বালানির দাম কমাতে। আন্দোলনের এই জয় আশা জাগিয়েছে মানুষের মনে। তাই পেনশন সংস্কারের নামে সাধারণ মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়ার সরকারি ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আবারও আন্দোলনেরই পথ ধরেছেন ফ্রান্সের খেটে-খাওয়া মানুষ।

ভারত সহ দেশে দেশে সাধারণ মানুষের উপর শাসক শ্রেণির আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে এই আন্দোলন অনুপ্রেরণা জোগাবে।

মাদকদ্রব্য বন্ধের দাবিতে জলপাইগুড়িতে বিক্ষোভ

জলপাইগুড়ি জেলার পাতকাটা অঞ্চলের ডোডালিয়ার শতাধিক মহিলা এলাকায় অবিলম্বে মদ, জুয়া, গাঁজা বন্ধের দাবিতে ৩ ডিসেম্বর জলপাইগুড়ি শহরে সমাজপাড়া মোড় থেকে বিক্ষোভ মিছিল করেন। এরপর কোতোয়ালি থানায় এবং আবগারি দপ্তরের আধিকারিকের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন বীণা রায়, মুক্তা রায়, নূপুরায় প্রমুখ। তাঁরা এ বিষয়ে অতি দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে মধ্যপ্রদেশে প্রতিবাদ সপ্তাহ পালন ডিওয়াইও-র

সারা দেশের মতো মধ্যপ্রদেশও ভয়াবহ বেকার সমস্যায় জ্বলছে। শূন্য পদে নিয়োগ হচ্ছে না। এর উপর জনগণের টাকায় তৈরি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির বেসরকারিকরণ করছে কেন্দ্রীয় সরকার। এসবের বিরুদ্ধে এআইডিওয়াইও মধ্যপ্রদেশ রাজ্য কমিটির ডাকে ২৬-৩০ নভেম্বর প্রতিবাদ সপ্তাহ পালিত হয়। গুনা, ভোপাল, গোয়ালিয়র, ইন্দোর, আরন সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় প্রতিবাদ মিছিল হয়। দাবি ওঠে, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির বেসরকারিকরণ করা চলবে না, রাজ্যের সরকারি দপ্তরগুলিতে অবিলম্বে সমস্ত শূন্যপদে নিয়োগ করতে হবে, প্রতিযোগিতামূলক ও ভর্তি পরীক্ষাগুলির জন্য ফি ধার্য করা চলবে না, সরকারি দপ্তরগুলিতে ঠিকা ও অস্থায়ী কর্মচারীদের অবিলম্বে স্থায়ীকরণ করতে হবে, উচ্চ-মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া অবিলম্বে শুরু করতে হবে, প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের জন্য অতি শীঘ্র বিজ্ঞাপন প্রকাশ করতে হবে।

পাঠকের মতামত

কালনেমির লঙ্কাভাগ

অযোধ্যা মামলার রায় বাহির হইয়াছে। যাঁহার বুকের পাটা আছে তিনি ইহাকে বিচার ব্যবস্থার প্রহসন বলিতেই পারেন। যাঁহাদের তাহা নাই, তাঁহারাও ইতিউতি অসন্তোষ ব্যক্ত করিতেছেন। রাজনীতির ব্যবসায়ীগণ 'দেশদ্রোহী' না হইবার তাগিদে মোটামুটি মানিয়া লইয়াছেন। রাষ্ট্রের প্রভুকূল যাহাতে রুষ্ট না হয়েন তজ্জন্য, 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' গোছের অবস্থানে নিজেদেরকে আবদ্ধ রাখিয়াছেন।

নেট দুনিয়ার কিছু অর্বাচীন বালক প্রশ্ন তুলিতেছেন, এইবার কি রামকে, স্বীয় পত্নীকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করিবার অপরাধে অভিযুক্ত করা হইবে? বা শূদ্র শম্বুক মুনির বিদ্যাচর্চার কারণে, তাঁহার হত্যাপরাধী রূপে রামকে অভিযুক্ত করা হইবে? অথবা লক্ষ্মণকে শূর্পনখার নাসিকাচ্ছেদনের কারণে 'অ্যাটেম্পট টু মার্ডার' কেসে অভিযুক্ত করা হইবে? ইত্যাদি, ইত্যাদি, ... সে যাহাই হউক, অপর একটি খবর প্রায় লোকচক্ষুর আড়ালে থাকিয়া যাইতেছে। রাম মন্দিরের কোষাগারের চাবি কাহার কাছে থকিবে—তাহা লইয়া ধর্মব্যবসায়ীদের মধ্যে চুলোচুলি, হাতাহাতি, লাঠালাঠি, এমনকি খুন করিবার ষড়যন্ত্র পর্যন্ত হইতেছে।

সংবাদে প্রকাশ, 'তপস্বী ছাউনির মহন্ত পরমহংস দাসের অভিযোগ, রামমন্দির তৈরির দাবিতে তিনি জেলে গিয়েছেন, আমরণ অনশনেও বসেছেন, কিন্তু এখন মন্দিরের জন্য সরকারের গড়া অছি পরিষদে তাঁর সামিল হওয়া রুখতে তাঁকে হত্যার চেষ্টা করেছে রামমন্দির ন্যাস। তাঁকে হত্যার চেষ্টার জন্যই লোক পাঠিয়েছেন ন্যাসের প্রধান নিত্যগোপাল দাস। (আনন্দবাজার পত্রিকা —১৭.১১.২০১৯)

আবার ন্যাসের সদস্য বেদান্তীর অভিযোগ 'রাম মন্দির নির্মাণের সমস্ত কৃতিত্ব একাই ঝুলিতে পুরতে চায় পরমহংস, সেই কারণেই নাকি তাঁকে নিত্যগোপালকে এবং যোগী আদিত্যনাথকে বদনাম করতে এই সব অপবাদ দিচ্ছেন, চক্রান্ত করছেন।' (ওই)

প্রকাশিত হইয়াছে, বিভিন্ন মঠ, আখড়া, মন্দিরের আলোচনায় কে কে থাকিবেন ওই ট্রাস্টে, কাহার হাতেই বা থাকিবে মন্দিরের চাবি, টাকার সিন্দুক, লড়াই মূলত ইহা লইয়াই। আবার বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বিরুদ্ধেও নির্মোহী আখড়ার মহন্ত দীনেন্দ্র দাসের অভিযোগ তহবিল নয়ছয়ের। (ওই)

যাহাই হউক, বিপুল প্রচারের আলোয় আলোকিত মন্দিরে যে বিপুল পরিমাণে অর্থাগম হইবে সকলেরই পাখির চোখ সেই অর্থের উপর। বহুদিন তাঁহারা কঠোর সন্ন্যাস ধর্ম পালন করিয়াছেন, বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন (যদিচ দুর্মুখে অন্য কথা বলে)। এক্ষণে সুযোগ সদ্ব্যবহার করিতে তাঁহারা, যে কোনও পন্থাই অবলম্বন করিতে পারেন। ধন্য সন্ন্যাস, ধন্য ধর্মবিশ্বাস!

এস মহাপাত্র, খড়্গপুর

টাস্ক ফোর্স কোথায়?

শাক-সব্জি সহ আলু পেঁয়াজের বাজার অগ্নিমূল্য। বর্তমান বাজারে পেঁয়াজ ১৫০-১৬০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে, যা সাধারণ মানুষের কেনার ক্ষমতার বাইরে। অথচ জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার পুতুলের মতো দেখছে।

নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী টাস্ক ফোর্স কর্মীদের হুঙ্কার দিয়েছিলেন অতি সত্বর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। কিন্তু টাস্ক ফোর্সের কোনও ফোর্সই সাধারণ মানুষ দেখতে পাচ্ছেন না। বাজারে দেদার দাম বেড়ে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রী একবার হুঙ্কারের পর সরকার পক্ষ থেকে কোনও পদক্ষেপ না নিয়ে মুখ বন্ধ করে বসে গেছেন। টাস্ক ফোর্সের কর্মীরা কোথায় গেছেন তার নাগাল নেই। সরকার ঘোষণা করে দায় সেরেছে যে চলতি বছরে পেঁয়াজ উৎপাদন কম হয়েছে। তাই বাজারে দাম বাড়ছে। উৎপাদন কম হলে সরকার বিদেশ থেকে আমদানি করে মজুত রাখার ব্যবস্থা করেনি কেন?

গৌরাঙ্গ মাইতি, সল্টলেক, কলকাতা

গণদাবীতে যা পাই

আমি গণদাবী পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। প্রতি শুক্রবার গণদাবী হাতে না পেলে অস্থির হয়ে উঠি। কারণ এক সপ্তাহে জমে থাকা নানা প্রশ্ন আমায় তাড়া করে। পাশাপাশি আমি অন্যান্য খবরের কাগজ পড়তেও অভ্যস্ত। দেখা যায় সেই সব কাগজের প্রথম পাতায় স্থান করে নেয় নানা নেতার চটকদারি কথা, আচরণ, দেখা যায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের নেতা-নেত্রীদের নানা অযৌক্তিক, অগণতান্ত্রিক ভাষণ, বিবৃতি। দেখা যায় চার পাশে মেলা, খেলা, নানা উৎসব, দান-খয়রাতির জন্য চটকদারি বিজ্ঞাপন ও হোর্ডিং। এই সব দেখে প্রশ্ন জাগে এগুলো সমাজ, সভ্যতার বা দেশের জনগণের কী উপকার করে? এই সব প্রশ্নের উত্তর পাই গণদাবী থেকে। মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, নারী নির্যাতন, চরম দুর্নীতি, অসহিষ্ণুতায় দেশের বেশির ভাগ জনজীবন বিপর্যস্ত। এসব থেকে মুক্তির পথ কী? গণদাবী থেকে তার আভাস পাওয়া যায়। শোষিত মানুষের শত্রু কারা, মিত্র কারা— চেনাচ্ছে গণদাবী।

কৃষ্ণপদ ঘোষ, বজবজ

দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় বিক্ষোভ

দুর্গাপুরে ইস্পাত কারখানায় বেতন চুক্তি সহ বিভিন্ন দাবিতে ৪ ডিসেম্বর কারখানার গেটে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এ আই ইউ টি ইউ সি-র অনুমোদিত ওয়ার্কার্স কো-অর্ডিনেশন কমিটি। বক্তব্য রাখেন ডিএসডব্লিউসিসি-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড বিশ্বনাথ মণ্ডল। উপস্থিত ছিলেন এআইইউটিইউসি পশ্চিম বর্ধমান জেলা সাধারণ সম্পাদক কমরেড সব্যসাচী গোস্বামী সহ আরও অনেকে।

সাম্যবাদের মূল নীতি

তিনের পাতার পর

নয়, সমাজের প্রত্যেকের কথা বিবেচনা করে সেই অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে সমাজের দ্বারা।

দ্বিতীয়ত, বৃহদায়তন শিল্প এবং তার উৎপাদনবৃদ্ধির অসীম ক্ষমতা এমন এক সমাজব্যবস্থার উদ্ভব ঘটাতে পারে যেখানে জীবনধারণের উপকরণগুলির উৎপাদনের প্রাচুর্য সমাজের প্রত্যেকটি সদস্যকে পূর্ণতম মাত্রায় তার শক্তি ও সামর্থ্যকে বিকশিত করতে এবং যথার্থ স্বাধীনভাবে তা প্রয়োগ করার সুযোগ দেয়। সঠিকভাবে বলতে গেলে, বৃহদায়তন শিল্পের যে বৈশিষ্ট্য আজকের সমাজে যাবতীয় দুর্দশা আর বাণিজ্যিক সংকটের জন্ম দিচ্ছে, ভিন্ন সামাজিক পরিস্থিতিতে এর সেই বৈশিষ্ট্যই এইসব দুর্দশা এবং বিপর্যয়কর ওঠা-পড়ার অবসান ঘটাবে।

এর মধ্য দিয়ে স্পষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে ঃ

১। এখন থেকে সমস্ত সামাজিক অকল্যাণের জন্য সেই বিশেষ সমাজব্যবস্থাই দায়ী বলে বুঝতে হবে, যে ব্যবস্থা সমাজের বাস্তব প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

২। একটা নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে এই সমস্ত অকল্যাণ নিঃশেষে দূর করা সম্ভব।

প্রশ্ন ঃ এই নতুন সমাজব্যবস্থাকে কেমন হতে হবে?

উত্তর ঃ এই নতুন সমাজ সর্বপ্রথমে, পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিদের হাত থেকে শিল্প এবং উৎপাদনের সমস্ত শাখার পরিচালনার ভার কেড়ে নেবে। এর বিপরীতে নতুন সমাজব্যবস্থা উৎপাদনের সমস্ত শাখাকে সামগ্রিকভাবে পরিচালনা করবে সামাজিক কর্তৃত্বে। অর্থাৎ সমাজের সকল সদস্যের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে সামাজিক কল্যাণের জন্য সামগ্রিক পরিকল্পনা অনুসারে তা পরিচালিত হবে। এর মধ্য দিয়ে প্রতিযোগিতার অবসান ঘটে আসবে সম্মিলিত প্রয়াস। ব্যক্তির দ্বারা শিল্প পরিচালনার অবশ্যম্ভাবী ফল ব্যক্তি মালিকানা। যেহেতু ব্যক্তি মালিকদের শিল্প চালাবার ধরনই হল পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা, তাই শিল্পের ব্যক্তিগত পরিচালনা এবং প্রতিযোগিতা থেকে ব্যক্তিগত মালিকানাকে আলাদা করা যায় না। কাজেই ব্যক্তিগত মালিকানারও অবসান ঘটাতে হবে। তার জায়গা নেবে সর্বসাধারণের দ্বারা উৎপাদনের সমস্ত হাতিয়ারের ব্যবহার এবং সর্বসাধারণের সম্মতির ভিত্তিতে সমস্ত উৎপাদনের বণ্টন। যাকে বলা হয় দ্রব্যসামগ্রীর যৌথ মলিকানা। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, ব্যক্তি মালিকানার বিলুপ্তিই হল গোটা সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তর যা বৃহদায়তন শিল্পের বিকাশের ফলে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে, তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনার সংক্ষিপ্ততম এবং তাৎপর্যপূর্ণ প্রকাশ। কমিউনিস্টরা সঠিকভাবেই ব্যক্তি সম্পত্তি বিলুপ্তির দাবিকে তাদের প্রধান দাবি হিসাবে তুলে ধরেছে।

প্রশ্ন ঃ ব্যক্তিগত সম্পত্তি লোপ কি এর আগে সম্ভব ছিল না?

উত্তর ঃ না। সমাজব্যবস্থার প্রত্যেকটা পরিবর্তন, মালিকানা সম্পর্কের প্রত্যেকটা বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন হল নতুন নতুন উৎপাদিকা-শক্তি সৃষ্টি হওয়ার অপরিহার্য ফল। এই নতুন উৎপাদিকা-শক্তি পুরনো মালিকানা সম্পর্কের সঙ্গে আর মানানসই থাকে না। ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবও এই পথেই হয়েছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি চিরকাল ছিল না। কিন্তু মধ্যযুগের শেষের দিকে চালু হয়েছিল এক নতুন উৎপাদনব্যবস্থা, সেটা হল ম্যানুফ্যাকচার (ছোট কারখানায় উৎপাদন ব্যবস্থা)। তৎকালীন সামন্ততান্ত্রিক আর গিল্ডের সম্পত্তির সঙ্গে এই উৎপাদন সম্পর্ক খাপ খাচ্ছিল না। এই উৎপাদন পদ্ধতি পুরনো মালিকানা সম্পর্কের পরিধিকে ছাপিয়ে গিয়ে জন্ম দিল নতুন ধরনের মালিকানা— ব্যক্তিগত মালিকানা। ম্যানুফ্যাকচার এবং বৃহদায়তন শিল্প গড়ে ওঠার প্রথম পর্যায়ের কালে ব্যক্তিগত মালিকানা ছাড়া কোনও ধরনের মালিকানা সম্ভব ছিল না। এই ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা নতুন সমাজব্যবস্থা ছাড়া অন্য সমাজব্যবস্থাও সেদিন সম্ভব ছিল না।

যতদিন পর্যন্ত সকলের চাহিদা মেটানোর মতো পর্যাপ্ত পরিমাণ উৎপাদনকে ছাপিয়ে গিয়ে সামাজিক পুঁজির বৃদ্ধি এবং উৎপাদিকা শক্তির আরও বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্বৃত্ত উৎপাদন সম্ভব না হয়, ততদিন পর্যন্ত সমাজে একটা প্রভুত্বকারী শ্রেণি সর্বদাই থাকে। যে শ্রেণি সমাজের উৎপাদিকা-শক্তিসমূহের পরিচালক, আর থাকে একটি দরিদ্র উৎপীড়িত শ্রেণি। উৎপাদনব্যবস্থার বিকাশের স্তরের উপর নির্ভর করে শ্রেণি-দুটির গঠন। মধ্যযুগ ছিল কৃষির উপর নির্ভরশীল, তখন ছিল ভূস্বামী আর ভূমিদাস। মধ্যযুগের শেষ ভাগের শহরগুলিতে আমরা দেখতে পাই দক্ষ কারিগর (গিল্ডসম্যান) ও তার অধীনে নানা শিক্ষানবিশ আর দিন মজুরদের। সপ্তদশ শতকে—ম্যানুফ্যাকচারার এবং ম্যানুফ্যাক্টরি শ্রমিক। উনিশ শতকে— বড় কারখানার মালিক আর সর্বহারা।

এটা নিতান্ত স্পষ্ট যে, এর আগে পর্যন্ত সকলের জন্য পর্যাপ্ত উৎপাদন করার মতো বিকাশ উৎপাদিকা শক্তির ঘটেনি, যাতে ব্যক্তিগত মালিকানা উৎপাদিকা শক্তিকে শৃঙ্খলিত করে তাকে বাধা দেয়। কিন্তু বৃহদায়তন শিল্পের সম্প্রসারণের ফলে এখন, প্রথমত, পুঁজি আর উৎপাদিকা শক্তি এমন পরিসরে সৃষ্টি হয়েছে যা এযাবৎ শোনা যায়নি। অল্পকালের মধ্যেই উৎপাদিকা শক্তির অসীম বৃদ্ধির উপায়-উপকরণ আজ মজুত। দ্বিতীয়ত, এইসব উৎপাদিকা শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়েছে মুষ্টিমেয় বুর্জোয়াদের হাতে, পক্ষান্তরে বিপুল জনরাশি ক্রমাগত বেশি বেশি পরিমাণে পরিণত হচ্ছে সর্বহারায়। যে পরিমাণে বুর্জোয়াদের ধনদৌলত বাড়ছে ঠিক সেই পরিমাণেই বিপুল জনরাশির দুর্দশা এবং দুর্বিষহ অবস্থা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তৃতীয়ত, এই মহাশক্তিশালী উৎপাদিকা শক্তিকে সহজেই বিপুল পরিমাণে বাড়ানো সম্ভব। এর বৃদ্ধি ব্যক্তিগত মালিকানা এবং বুর্জোয়া ব্যবস্থার পরিধিকে এতখানি ছাড়িয়ে গেছে এর ধাক্কায় বারে বারে তীব্র আলোড়নে সমাজব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। তাই এখনই ব্যক্তিগত সম্পত্তি লোপ করার সম্ভাবনা বাস্তব হয়ে উঠেছে শুধু তাই নয়, তা হয়ে উঠেছে একেবারেই অপরিহার্য।

(চলবে)

ভ্রম সংশোধন ঃ

গণদাবী ৭২ বর্ষ ১৭ সংখ্যায় 'প্রতিদিন গড়ে ৩১ জন চাষি আত্মঘাতী' শীর্ষক লেখায় 'নিম্ন-মধ্য ও মধ্যচাষিরা হল ১৩.২ শতাংশ।' এর পরে যুক্ত হবে 'এদের হাতে চাষের জমি রয়েছে ৪৩.৬ শতাংশ। আর যারা ধনীচাষি তারা হল গ্রামীণ জনসংখ্যার মাত্র দশমিক ছয় শতাংশ।' অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

ওড়িশায় শ্রমিক সম্মেলন

এ আই ইউ টি ইউ সি-র দ্বিতীয় সুন্দরগড় জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ২৪ নভেম্বর ওড়িশার রাউরকেলায়। প্রধান অতিথি ছিলেন কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত। প্রধান বক্তা ছিলেন কমরেড প্রহ্লাদ সাহু।

নবজাগরণের পথিকৃৎ বিদ্যাসাগর

ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এই মহান মানবতাবাদীর জীবন ও সংগ্রাম পাঠকদের কাছে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হচ্ছে।

(১৯)

বঙ্কিমচন্দ্র ও বিদ্যাসাগর

১৮৫৬ সালে বিধবাবিবাহ আইন পাশ হয়েছিল। এর মধ্য দিয়ে এক কঠিন লড়াইয়ে জয়ী হয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। কিন্তু শুধু আইন দিয়েই যে সমাজ-মননের জড়তা, পশ্চাদপদতা ইত্যাদি দূর করা সম্ভব নয়, এ তিনি ভালভাবে জানতেন। তাই, এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে মানুষের মধ্যে সচেতনতা এবং বিশেষত নারীশিক্ষার ব্যাপক প্রসারে বিদ্যাসাগর রাতদিন অক্লান্ত পরিশ্রম শুরু করেন। জেলায় জেলায়, গ্রামে গ্রামে গিয়ে স্কুল স্থাপন, শিক্ষক নিয়োগ, তাদের বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট প্রায় সমস্ত কর্মপ্রক্রিয়ার সাথে ওতপ্রোতভাবে তিনি যুক্ত থেকেছেন। এর মধ্যেই বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষা এবং গদ্যকে ভাবপ্রকাশের উপযোগী করে তোলার জন্য ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন। এই সময়েই তিনি লিখেছেন অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তক, বই এবং 'কথামালা' (১৮৫৬), 'চরিতাবলী' (১৮৫৬), 'সীতার বনবাস' (১৮৬০)', 'আখ্যানমঞ্জরী' (১৮৬৩), 'শব্দমঞ্জরী' (১৮৬৪), 'ভ্রান্তিবিলাস' (১৮৬৯) ইত্যাদি।

এই প্রায় পনেরো বছর ধরে বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ বন্ধ করার জন্যও সমাজের নানা স্তরে আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক, ঘরোয়া সভা ইত্যাদি চালিয়ে গিয়েছেন। সে-সবের ধারাবাহিকতায় ১৮৭১ সালের ৮ আগস্ট বিদ্যাসাগর যে পুস্তকটি লিখে প্রকাশ করলেন সেটি হল, 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিৎ কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব'। এই বইতে তিনি তথাকথিত শাস্ত্রীয় পণ্ডিতদের কু-তর্কের জবাব দিলেন। রক্ষণশীল পণ্ডিতসমাজ বলত, শাস্ত্রে বহুবিবাহের বিধান আছে। বিদ্যাসাগর শাস্ত্র উদ্ধৃত করে দেখিয়ে দিলেন, তাঁদের কথা ঠিক নয়। ওই পণ্ডিতসমাজের অনেকে তখন পাল্টা বই লিখে বিদ্যাসাগরকে আক্রমণ করলেন। সে-সব বইতে যা বলা হয়েছিল, তার প্রত্যেকটি কথার জবাব বহু উদাহরণ সহ তুলে ধরে ১৮৭৩ সালের ২ এপ্রিল বিদ্যাসাগর আবার লিখে প্রকাশ করলেন, 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিৎ কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' (দ্বিতীয় পুস্তক)। বিদ্যাসাগরের বয়স তখন ৫৩। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তখন উচ্চপদস্থ সরকারি অফিসার, বঙ্গদর্শন পত্রিকার সম্পাদক এবং ওই পত্রিকাতেই ধারাবাহিক 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাস লিখছেন। তাঁর বয়স তখন ৩৫। (উপন্যাসটি বই আকারে প্রকাশিত হয় ১৮৭৩ সালের ১ জুন।)

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের বিষয় নরনারীর সম্পর্কভিত্তিক হলেও এর প্রধান আধার বিধবাবিবাহ এবং বহুবিবাহ। এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র একটি চরিত্রের সংলাপের মাধ্যমে ব্যঙ্গ করে বললেন, 'বিধবাদের যে বিয়ে দেয় সে যদি পণ্ডিত হয়, তবে মূর্খ কে?' উপন্যাস শেষ করেই বঙ্কিমচন্দ্র 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিৎ কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' (দ্বিতীয় পুস্তক) -কে কেন্দ্র করে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে দীর্ঘ এবং অত্যন্ত আক্রমণাত্মক এক সমালোচনা লেখেন বঙ্গদর্শন পত্রিকায়। সেই সমালোচনায় তিনি মূলত যা বললেন তা হল, 'বহুবিবাহ একটি নিন্দনীয় প্রথা। কিন্তু এই প্রথাকে সমাজ থেকে দূর করার জন্য শাস্ত্রীয় প্রমাণ দাখিল করার কোনও প্রয়োজন নেই, আইন করারও কোনও প্রয়োজন নেই। কারণ, এই প্রথার চল সমাজে এমনিতেই কমে এসেছে এবং বাকি যেখানে যেটুকু আছে, তা আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের সাথে সাথে সম্পূর্ণ দূর হয়ে যাবে। তা ছাড়া, এদেশে মুসলিমরাও আছে, ফলে হিন্দুদের জন্য এক আইন আর মুসলিমদের জন্য আরেক আইন সম্ভব হবে না।' প্রসঙ্গত, এই অভিযোগগুলি কোনওটাই বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম করেননি। তাঁর আগেই রক্ষণশীল পণ্ডিতসমাজ এই প্রশ্নগুলি তুলেছেন। এবং 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিৎ কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (প্রথম পুস্তক)'-এ বিদ্যাসাগর প্রত্যেকটি প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব দিয়েছেন।

তারপরেও, এই অভিযোগগুলির সাথে বঙ্কিমচন্দ্র অভিযোগ করেন, 'বিদ্যাসাগর নানা শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি ইত্যাদি তুলে এনে প্রকাশ করেছেন নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করার জন্য।' ওই সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ করেছেন যে, 'বিদ্যাসাগর অন্যান্য মত খণ্ডন করতে গিয়ে অহেতুক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের অপমান করেছেন।' বঙ্কিমচন্দ্র যৌবনের প্রারম্ভে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বলতেন, 'তিনি ছেলেদের জন্য খানকতক বই লিখেছেন মাত্র।' বঙ্কিমচন্দ্র বলতেন, 'বিদ্যাসাগর বড় বড় সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করে বাঙলা ভাষার ধাতটা গোড়ায় খারাপ করে গেছেন।' বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস' সম্পর্কেও বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্রূপ করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের এহেন মতামতের জবাবে বিদ্যাসাগর লিখিতভাবে কখনও কোথাও কিছু বলেননি। বহু পত্র-পত্রিকা বিদ্যাসাগরের পক্ষ নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে বিস্তর গালমন্দ, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করলেও বিদ্যাসাগর কিছুই লেখেননি। অমৃতবাজার পত্রিকা বহুবিবাহ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মতামত সমর্থন করলেও ২৬ জুন ১৮৭৩ সংখ্যায় লিখেছে, "বঙ্গদর্শন বিদ্যাসাগর সম্পর্কে যা লিখেছে তা পাঠ করে আমরা দুঃখিত হলাম। ...বিদ্যাসাগর মশাই দেশপূজ্য ব্যক্তি, তাঁর কোন ভ্রান্তি দেখলে আমরা দুঃখিত হয়ে তাঁকে বড়জোর দেখিয়ে দিতে পারি, সেজন্য তাঁকে ছলে কৌশলে লম্বা উপদেশ দিতে পারি না।" এরপর ওই পত্রিকা (৩ জুলাই ১৮৭৩) লিখেছে, "বঙ্গদর্শন সম্পাদক (বঙ্কিমচন্দ্র) নতুন লেখক, সুতরাং তাঁর সহস্র অপরাধ মার্জ্জনীয়। আমাদের ভরসা, তাঁর মত সুবোধ সম্পাদক আরো একটু শিক্ষিত হলে এ ভ্রমের পুনরাবৃত্তি হবে না।"

বাস্তবে, সে সময়ে, বঙ্কিমচন্দ্রের দাবি অনুযায়ী, বহুবিবাহ যে সমাজে অচল হয়ে আসছে না, বরং পুরোমাত্রায় বহাল রয়েছে, সে বিষয়ে বিদ্যাসাগর নিজে গ্রামভিত্তিক সমীক্ষা করে তথ্য-পরিসংখ্যান দিয়ে দেখিয়েছিলেন। প্রায় তিনশো ব্যক্তির নাম-ধাম, বয়স এবং বিবাহের সংখ্যা তিনি প্রকাশ করেছিলেন, যাকে কেউই অস্বীকার করতে পারেননি। দ্বিতীয়ত, বহুবিবাহ রদ করার জন্য আইন করা কেন প্রয়োজন সে বিষয়েও বিদ্যাসাগর বিস্তৃত আলোচনা করে দেখিয়েছিলেন। তৃতীয়ত, মুসলিম সম্প্রদায় সম্পর্কে যে ভিত্তিহীন অভিযোগ তোলা হয়েছিল, তার জবাবও বিদ্যাসাগর দিয়েছিলেন। 'বহুবিবাহ' সংক্রান্ত তাঁর প্রথম বইতে পর পর সে সমস্ত আলোচনা রয়েছে। সেগুলি কেউই খণ্ডন করতে পারেননি।

সংস্কৃত শব্দ বিদ্যাসাগরের চেয়ে বঙ্কিমচন্দ্রই ব্যবহার করতেন বেশি। তাই, তাঁর উপন্যাস পড়া আজও এক অতি কঠিন কাজ সাধারণের পক্ষে। 'সীতার বনবাস' নিয়ে সে সময়েই বিদ্বৎমহলে যে প্রবল উচ্ছ্বাস দেখা দিয়েছিল তা বঙ্কিমচন্দ্রের বিদ্রূপকে টিকতে দেয়নি। এমনকি এই বই সাধারণ পাঠকেরও হৃদয় স্পর্শ করেছিল। 'সীতার বনবাস' সম্পর্কে অসংখ্য বিদ্বজ্জনের অগণিত শ্রদ্ধার্ঘ্যের প্রকাশ ঘটেছে। তবু, বঙ্কিমচন্দ্র তো দ্বিমত হতেই পারেন। সম্ভবত সে কারণেই বিদ্যাসাগর কোথাও কখনও বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে কোনও বিরূপ কথা বলেননি, লেখেননি। সম্ভবত সে-যুগে দাঁড়িয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশ্নশীল মনকে, যৌবনের তেজকে তিনি কোনওভাবে নিরুৎসাহিত করতে চাননি। সম্ভবত বিদ্যাসাগর ভেবেছিলেন, হোক আমার সমালোচক, কিন্তু বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের বিকাশে বঙ্কিমচন্দ্রের মতো প্রতিভাবানের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

তাই, যখন একদিন এক ব্যক্তি বিদ্যাসাগরের কাছে এসে বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্র নিয়ে নানা কুৎসা করছে, বঙ্কিমচন্দ্র কীভাবে রাত কাটান তার বিশ্রী বর্ণনা দিচ্ছে, তখন বিদ্যাসাগর বুঝলেন ব্যক্তিটি তাঁকে 'বঙ্কিম-বিরোধী' ভেবে তোষামোদ করছে। বিদ্যাসাগর সব শুনে প্রথমে খুব হাসলেন। তারপর মজা করে বললেন, "লোকটা (বঙ্কিমচন্দ্র) সমস্ত দিন গভর্নমেন্টের কাজে ব্যস্ত থাকে। আবার রাত্রেও যদি ওই রকমে কাটায়, তাহলে বই লেখে কখন? তার কেতাবে যে আমার আলমারির একটা সেলফ ভরে গেল। ও হে, তোমার কথা শুনে তো বঙ্কিমচন্দ্রের ওপর আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল।" এই ছিলেন বিদ্যাসাগর।

বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগরকে চিনতে পেরেছিলেন। তাই বিদ্যাসাগর আঘাত পেতে পারেন ভেবে ওই ধরনের অহেতুক আক্রমণাত্মক লেখা আর কখনও বঙ্কিমচন্দ্র লেখেননি। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পরে বহুবিবাহ পুস্তকের ওই সমালোচনামূলক প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্র একটি গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু তা করেছেন প্রবন্ধটির অনেক অংশ বাদ দিয়ে, শুধু মতবিরোধ অংশটুকুমাত্র রেখে, ব্যক্তিগত আক্রমণের অংশগুলি সযত্নে বর্জন করে। ঘটনা হল, বিদ্যাসাগরের অগাধ পাণ্ডিত্য, সামাজিক সক্রিয়তা, বিরলতম দরদি মন ইত্যাদিকে পরিণতমনস্ক বঙ্কিমচন্দ্র কোনও ভাবেই অস্বীকার করেননি, করতে চাননি। বিশেষত, বাংলা গদ্যে, ভাষায়, সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের ঐতিহাসিক অবদান স্বীকার না করে তিনি পারেননি। তাই বঙ্কিমচন্দ্রই এক সময় বলেছেন, "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্বে কেহই এমন সুমধুর বাঙ্গালা লিখিতে পারে নাই, এবং তাঁহার পরেও কেহ পারে নাই।" বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত ও গঠিত বাংলা ভাষাই আমাদের মূলধন। তাঁরই উপার্জিত সম্পত্তি নিয়ে নাড়াচাড়া করছি।" এমনকি তিনি বিদ্যাসাগরের লেখা নিয়ে প্রবন্ধ সংকলনও প্রকাশ করেছেন। (চলবে)

বিদ্যাসাগর স্মরণ রানাঘাটে

হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠন রানাঘাট শাখার উদ্যোগে ১ ডিসেম্বর রানাঘাট পালচৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়ে মহান মানতাবাদী বিদ্যাসাগরের দ্বিশত জন্ম বর্ষ উদযাপিত হয়। প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ অশোক সামন্ত, ডাঃ সত্যজিৎ রায়, ডাঃ অপূর্ব রায়, ডাঃ সত্যেন মজুমদার, ডঃ মৃদুল দাস এবং সভায় উপস্থিত ছাত্র-শিক্ষক-চিকিৎসক সহ অন্যরা। বক্তব্য রাখেন শিক্ষক দেবাশিষ ঘোষ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সম্পাদক শীতল দে।

প্রথম বিধবাবিবাহ দিবস উদযাপন

১৮৫৬ সালের ১৬ জুলাই বিধবাবিবাহ আইন পাস হওয়ার পর ওই বছরই ৭ ডিসেম্বর কলকাতায় বিদ্যাসাগরের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রথম বিধবাবিবাহ। এ বছর বিদ্যাসাগরের দ্বিশত জন্মবর্ষ উপলক্ষে সেই ঐতিহাসিক দিনটি উদযাপন করল 'সারা বাংলা বিদ্যাসাগর দ্বিশত জন্মবর্ষ উদযাপন কমিটি'। এদিন সকালে যে বাড়িতে ওই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল, কৈলাস বোস স্ট্রিটে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই বাড়ির সামনে বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে বক্তব্য রাখেন ওই বাড়ির সদস্য ডাঃ মিনতি বন্দ্যোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ডঃ ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক কমল সাঁই সহ এলাকার বহু নাগরিক। ৭ ডিসেম্বর স্মরণে ওই দিনই মহাবোধি সোসাইটি হলে কমিটির পক্ষ থেকে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন কলকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী পার্থসারথি সেনগুপ্ত, অধ্যাপক মহীদাস ভট্টাচার্য এবং ডাঃ নূপুর বন্দ্যোপাধ্যায়।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী যৌথ মিছিল

ঐতিহাসিক সৌধ বাবরি মসজিদ ধ্বংসের দিন ৬ ডিসেম্বর সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ও এনআরসি বাতিলের দাবিতে কলকাতায় এস ইউ সি আই (সি) সহ ১৭টি বামপন্থী দলের মিছিল। মিছিলে নেতৃত্ব দেন দলের রাজ্য সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অমিতাভ চ্যাটার্জি সহ অন্যান্য বামপন্থী দলগুলির নেতৃবৃন্দ। এসপ্ল্যানেড থেকে শুরু হয়ে মিছিল রাজাবাজারে পৌঁছনোর পর সেখানে একটি প্রতিবাদ সভা হয়।

কন্ট্রাকচুয়াল কর্মীদের দাবি আদায়

এআইইউটিইউসি অনুমোদিত কন্ট্রাকচুয়াল ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের ধারাবাহিক আন্দোলনের চাপে এস আই এস পি এল বকেয়া বেতন মিটিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। ফোরাম স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার বিভিন্ন জোনাল এবং রিজিওনাল অফিসে ডেপুটেশন দিয়েছে এবং বিক্ষোভ দেখিয়েছে। বারুইপুর, রায়গঞ্জে কয়েকদিন ধরে স্টেট ব্যাঙ্কে বিক্ষোভ হয়েছে। শিলিগুড়ি লেবার কমিশনারের অফিসেও এ নিয়ে দাবি পেশ করা হয়েছে। অবশেষে লেবার কমিশনার বেতন দেওয়ার রায় দেন এবং ৫ ডিসেম্বর সেই বেতন দেওয়া হয়।

শিলিগুড়িতে ছাত্র-যুব-মহিলা বিক্ষোভ

সারা দেশে ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে এবং সূর্য সেন কলেজের ছাত্রী আঞ্জুমা খাতুনের ধর্ষক ও খুনিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে দার্জিলিং জেলা ডিএসও, ডিওয়াইও, এমএসএস-এর পক্ষ থেকে ৭ ডিসেম্বর শিলিগুড়ি শহরে বিক্ষোভ দেখানো হয়।

প্রতিবাদে মুখর সারা দেশ

দেশের নানা প্রান্তে ঘটে চলা নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে ২ ডিসেম্বর গুজরাটের আহমেদাবাদ (উপরের ছবি) ও ভদোদরায় এবং ৩ ডিসেম্বর সুরাটে প্রতিবাদ মিছিল ও সভা অনুষ্ঠিত হয়। (নিচে) ৩ ডিসেম্বর কলকাতার এনআরএস মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে মোমবাতি মিছিলে সামিল ডাক্তার, নার্স, মেডিকেল ছাত্র ও চিকিৎসাকর্মীরা।

জন্মদিবসে শহিদ ক্ষুদিরাম স্মরণ

৩ ডিসেম্বর সারা রাজ্যের সাথে পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদায় শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর ১৩১তম জন্মদিবস পালিত হল। স্টেশন প্রাঙ্গণে শহিদের পূর্ণাবয়ব মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়। স্কুল-কলেজ সহ বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে বিকেলে ১৩১টি মোমবাতি জ্বালিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন কমিটির সভাপতি তপনেশ দে, সম্পাদক পরেশ বেরা, নাট্যব্যক্তিত্ব যুগজিৎ নন্দ, সুশান্ত পানিগ্রাহী, মানস কর প্রমুখ।

হরিয়ানার গুরগাঁও-এ শ্রমিক বিক্ষোভ

৬ ডিসেম্বর হরিয়ানার মানেসরে (গুরগাঁও) হন্ডা কারখানার গেটে শ্রমিকদের বিক্ষোভ সভা। আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে সভায় বক্তব্য রাখেন এ আই ইউ টি ইউ সি নেতা কমরেড রাজিন্দার সিং।

পুলিশি হয়রানি বন্ধের দাবি মোটরভ্যান চালকদের

উত্তর ২৪ পরগণার টিটাগড়-সোদপুর এলাকায় স্বল্প ভাড়ায় নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দীর্ঘকাল সরবরাহ করে আসছে মোটরভ্যান। অথচ বাধ সাধছে প্রশাসনের একাংশ। জোর করে ইঞ্জিনের হ্যান্ডেল কেড়ে নিয়ে দীর্ঘ সময় পণ্যবোঝাই গাড়ি আটকে রাখছে ট্রাফিক পুলিশ। হয়রানি বন্ধে ২১ নভেম্বর এআইইউটিইউসি অনুমোদিত সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের আঞ্চলিক কমিটির ডাকে পাঁচ শতাধিক চালক খড়দহ থানায় বিক্ষোভ দেখান। বক্তব্য রাখেন এআইইউটিইউসি-র জেলা সম্পাদক কমরেড প্রদীপ চৌধুরী এবং ইউনিয়নের পক্ষে কমরেডস জয়ন্ত সাহা, করুণ দত্ত, চন্দ্রশেখর চৌধুরী প্রমুখ। শ্রমিক নেতা কমরেড অমল সেনের নেতৃত্বে আটজনের প্রতিনিধিদল সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের সাথে কথা বলে পিক আওয়ার ছাড়া বাকি সময় অবাধে যান চলাচলের দাবি আদায় করেন।

মেট্রোর ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে জিএম-কে স্মারকলিপি

মেট্রো রেলে বর্ধিত ভাড়া প্রত্যাহারের দাবিতে ৩ ডিসেম্বর এসইউসিআই (সি) কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড সুব্রত গৌড়ীর নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের এক প্রতিনিধিদল মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজারের কাছে স্মারকলিপি জমা দেয়।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com